৫

সামাজিক বিভাজন বা বৈষম্য
Social Differentiation

সমাজে বিভিন্ন বর্গের মানুষজনের মধ্যে নানান ধরনের বিভাজন থাকে বলে নৃবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন। যেমন নারী-পুরুষের মধ্যে বিভাজন, ধনী-গরিবের মধ্যকার বিভাজন ইত্যাদি। কখনো কখনো এই বিভাজন কেবলমাত্র সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যের পার্থক্য তৈরি করে। অর্থাৎ কে কি করবেন, কার কি দায়িত্ব এই ভাবনা থেকে বিভাজন করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই সকল বিভাজনের মধ্য দিয়ে সমাজে বৈষম্য বা অসমতা কাজ করছে। তার মানে হচ্ছে: ক্ষমতা, সম্পদ কিংবা মর্যাদা ইত্যাদি ব্যাপারে ফারাক তৈরি হচ্ছে। নৃবিজ্ঞানীদের অনেকে মনে করেছেন যে, বৈষম্য আধুনিক সমাজে কম। কিন্তু নানারকম গবেষণায় এটা এখন প্রমাণিত যে এই ধারণা সঠিক নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সামাজিক অসমতা নানা রকম ভাবে ক্রিয়াশীল আছে। যেটা লক্ষ্য রাখতে হবে তা হ'ল: ভাগ করা মানেই সবক্ষেত্রে বৈষম্য বা এক দল কর্তৃক অন্যকে নিপীড়ন করা নয়। কোন সমাজ বয়সে বড়-ছোট মেনে চলে বলেই এই নয় যে সেখানে বড়রা ছোটদের উপর নিয়ন্ত্রণ বা নির্যাতন কায়েম করে থাকেন। এই ইউনিটে আপনারা সামাজিক বিভাজন বা বৈষম্য নিয়ে আলোচনা পাবেন। ৪টি পাঠে পাঁচ ধরনের বিভাজন নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে: লিঙ্গ, বয়স, পদ-মর্যাদা, জাতিবর্ণ এবং শ্রেণী। এখানে বর্তমান কালের সমাজের প্রসঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে। যে পাঁচ ধরনের বৈষম্যের কথা এসেছে তার মধ্যে পদ-মর্যাদা বিষয়ক আলোচনা বর্তমান কালের সমাজে শ্রেণী আলোচনার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেখা প্রয়োজন।

◆ পাঠ - ১ : লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভাজন
◆ পাঠ - ২ : বয়সের ভিত্তিতে বিভাজন
◆ পাঠ - ৩ : পদমর্যাদা-ভেদাভেদ
◆ পাঠ - ৪ : শ্রেণী ও জাতিবর্ণ স্তরবিভাজন

লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভাজন
Differentiation by Sex

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসম সম্পর্ক বিদ্যমান
- নারী ও পুরুষের কাজ ভিন্ন হওয়া মানেই অসমতা নয়
- নারী ও পুরুষের মধ্যকার অসমতা জৈবিক বা স্বাভাবিক নয়, সামাজিক

দৈহিক নৃবিজ্ঞান (physical anthropology) চর্চার প্রারম্ভিক কালে নারী ও পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য বা প্রভেদকে শারীরিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার করা হ'ত। নারী ও পুরুষের শরীরের গড়নের ভিন্নতা নিয়ে তাঁদের আলাপ-আলোচনার সূচনা হয়ে থাকে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় সমাজে নারী-পুরুষের ক্ষমতা, মর্যাদা কিংবা অন্যান্য সুযোগের পার্থক্য বোঝা যায় না। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান তাই গোড়া থেকেই অন্য উপায়ে সমাজের মধ্যকার নারী-পুরুষের পার্থক্য দেখবার চেষ্টা করেছেন। খেয়াল রাখা দরকার নৃবিজ্ঞানের প্রাথমিক কালে গবেষণা করা হ'ত কেবল অ-ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে। তাই প্রাথমিক নৃবিজ্ঞানে দেখা হ'ত কোন সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে কি ধরনের ভিন্নতা আছেঃ দায়িত্বের দিক থেকে, কোন আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের দিক থেকে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের দিক থেকে, কিংবা সমাজে মর্যাদার দিক থেকে। প্রাথমিক কালের নৃবিজ্ঞানের বই-পত্রে এই বিষয়ে আলাপ পাওয়া যেত। আর এই অধ্যয়নকে বলা হ'ত নারী-পুরুষের প্রভেদ। কিন্তু এখানে আরও একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখার আছে। তা হ'লঃ '৬০ – '৭০ দশকে পৃথিবী জুড়ে সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে ভীষণ বিতর্ক ওঠে। এই বিতর্কে তোলেন নারীর পক্ষে আন্দোলনের কর্মীরা এবং নারীর অবস্থান নিয়ে চিন্তিত শিক্ষাবিদেরা। এই বিতর্কে নারীর সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় মর্যাদা, ক্ষমতা এবং সম্পদের বিষয়গুলোকে। সেটা করতে গিয়েই মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা চলে আসে। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

'৬০ – '৭০ দশকে পৃথিবী জুড়ে সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে ভীষণ বিতর্ক ওঠে। এই বিতর্ক তোলেন নারীর পক্ষে আন্দোলনের কর্মীরা এবং নারীর অবস্থান নিয়ে চিন্তিত শিক্ষাবিদেরা। এই বিতর্কে নারীর সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় মর্যাদা, ক্ষমতা এবং সম্পদের বিষয়গুলোকে।

এই বিতর্কের তোলপাড় বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডে এসে পড়ে। নারী বিষয়ক মনোযোগ তাতে একেবারে বদলে যায়। নৃবিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয়। এই সময়ে এসে নারী বিষয়ক পড়াশোনাকে নারী চিন্তাবিদেরা আর নারী-অধ্যয়ন (women's studies) বলতে চাইলেন না। তাঁদের পরিষ্কার কিছু যুক্তি ছিল। যেহেতু নারীর অবস্থান সমাজে পুরুষের অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই নারী ও পুরুষের অবস্থানের পার্থক্য একটা তুলনামূলক ব্যাপার। একই সঙ্গে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝাটাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই নারী পুরুষের সামাজিক সম্পর্কে মনোযোগ দিতে চাইলেন তাঁরা। এতে নতুন একটা ধারণা বা প্রত্যয় দেখা গেল। ইংরেজীতে তা হচ্ছে জেন্ডার (gender)। সেক্স (sex) শব্দটা দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যকার শারীরিক বা জৈবিক পার্থক্য বোঝাতো। সেটা এখনও বোঝায়। কোন দরখাস্ত পূরণ করতে গেলে দেখা যায় সেখানে 'সেক্স' জানতে চাওয়া হয়। বিতর্কের পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজি ভাষায় জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার শুরু হ'ল। এই শব্দ দ্বারা সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যকে কিংবা সামাজিক অবস্থানকে বোঝানো হয়। '৮০-এর দশকে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের কর্মী ও চিন্তাবিদেরা মিলে এই জেন্ডার শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ বাছাই করেছেন 'লিঙ্গ'। তাই লিঙ্গীয় সম্পর্ক বলতে নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক বোঝায়। আর লিঙ্গীয় বৈষম্য বলতে নারী-পুরুষের মধ্যকার সামাজিক অসমতা বোঝায়। এখানে অসমতা বলতে সহজভাবে ক্ষমতা, মর্যাদা আর সম্পদের পার্থক্যকে বোঝা যেতে পারে। তবে নারী ও পুরুষ ছাড়া আরও একটি লিঙ্গ সমাজে আছে। তাঁদের কথা স্মরণে না রাখলে চলবে না। কারণ তাঁরাও হিজড়া একটা সুবিধা বঞ্চিত লিঙ্গ এবং নির্যাতিত।

ইংরেজি জেন্ডার শব্দ দ্বারা তেমনি সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যকে কিংবা সামাজিক অবস্থানকে বোঝানো হয়।

অ-ইউরোপীয় কিংবা *সরল* সমাজে নারী-পুরুষের প্রভেদ

আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে প্রথম কালের নৃবিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন ইউরোপের বাইরের সমাজে। সাধারণভাবে যে সকল সমাজ শিল্পোন্নত কিংবা প্রযুক্তি নির্ভর ছিল না, নৃবিজ্ঞানের আগ্রহ ছিল সেই সব সমাজ নিয়ে। আফ্রিকা, এশিয়া কিংবা আমেরিকার আদিবাসীদের এই সব সমাজকে প্রথম পর্যায়ের নৃবিজ্ঞানে 'আদিম' সমাজ বলা হ'ত। পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৃবিজ্ঞানীরা এই সব সমাজের নাম দেন 'সরল' সমাজ। প্রথম দিকের নৃবিজ্ঞানে সামাজিক বিভাজন দেখতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা মূলত কাজ কর্মের ভাগাভাগির পদ্ধতির উপর মনোযোগ দিয়েছেন। কোন সমাজে কাজ কর্মের ভাগাভাগির প্রক্রিয়াকে সামাজিক বিজ্ঞানে **শ্রম বিভাজন** বলা হয়। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন মানুষ কি কি দায়িত্ব পালন করবে তার একটা ব্যবস্থা থাকে। এভাবেই সমাজে উৎপাদন হয়। এখানে নারী-পুরুষের বিভাজনের কথা হচ্ছে। এখানে মনে রাখা দরকার নৃবিজ্ঞানীরা যে সব সমাজে গবেষণা চালিয়েছেন সেই সময়ে তার অনেকগুলোতেই আজকের যুগের মত বৈষম্য ছিল না। তা সে নারী পুরুষের মধ্যেই হোক, আর সমাজের মানুষে মানুষে হোক। তাছাড়া আজকের যুগে সম্পদের রকম অনেক বেড়ে গেছে। ফলে সম্পদের ভিত্তিতে ভেদাভেদ তৈরি হবার পরিস্থিতি এখন অনেক তীব্র।

সমাজে এক সময় **মাতৃ-অধিকার** ছিল বলে সামাজিক বিজ্ঞানের অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন। মাতৃ-অধিকারের ধারণা দিয়েছেন বাকোফেন, এঙ্গেলস, মর্গান প্রমুখ। এই ধারণার সারাংশ হচ্ছে: এক সময়ে পুরুষের হাতে ক্ষমতা ছিল না। সমাজ এবং পরিচালনার যাবতীয় কর্তৃত্ব ছিল নারীর হাতে। কেবল তাই নয়, সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হ'ত মায়ের দ্বারা। মায়ের বংশই স্বীকৃত হ'ত। সেই সমাজের নাম দেয়া হয়েছে আদি সাম্যবাদী সমাজ। এই ধারণার পক্ষে নানান যুক্তিও তাঁরা হাজির করেছেন। সামাজিক বিজ্ঞানে এই ধারণা যুগান্তকারী হিসেবে দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে নারীর লড়াইয়ে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের জন্য এটা একটা বিরাট উদ্যম হিসেবে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এই চিন্তার যাবতীয় দুর্বলতা ধরা পড়ে। প্রথমত, কোন এক কালে এই ব্যবস্থা ছিল – এটা একটা অনুমান করা ব্যাখ্যা। যখন থেকে নৃবিজ্ঞানের গবেষণা চলছে তখন এর তেমন কোন উদাহরণ পাওয়া যায়নি। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে সমাজে মায়ের পরিচয় ধরেই আত্মীয়তা বা আবাস-বাড়ি গড়ে উঠছে। কিন্তু মাতৃ-অধিকারের ধারণা থেকে তা খুবই ভিন্ন। বরং বিভিন্ন সমাজে নারীর প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব, কিংবা নিপীড়নের নানা রকম ধরন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এ কথা ঠিক, সমাজভেদে তা ভিন্ন, এবং অধিকাংশ অতীতের সমাজে এর নজির খুবই কম। দ্বিতীয়ত, মাতৃ-অধিকার যদি থেকেই থাকে তাহলে তা কেন সহসা বদলে গেল তার কোন ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, অনেক নারী আন্দোলনকারী মনে করেন: এ রকম কাল্পনিক একটা তত্ত্ব ধরে নিয়ে এগোলে বর্তমান কালের পুরুষের ক্ষমতা এবং পুরুষকেন্দ্রিক ব্যবস্থা অনুমোদন পায়। মানে 'এক সময়ে যেহেতু নারীর ক্ষমতা ছিল – এখন তাহলে পুরুষের ক্ষমতার দোষ কি!' তাঁদের ব্যাখ্যা হচ্ছে: যদি নারীকেন্দ্রিক সমাজ কখনো থেকেই থাকে – তার গড়ন আজকের মত আক্রমণাত্মক ছিল না। সেটা সমাজ ইতিহাস বিশে- ষণ করলে বোঝা যায়।

*এক সময় **মাতৃ-অধিকার** ছিল বলে সামাজিক বিজ্ঞানের অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন। সমাজ এবং পরিচালনার যাবতীয় কর্তৃত্ব ছিল নারীর হাতে। কেবল তাই নয়, সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হ'ত মায়ের দ্বারা।*
(বাকোফেন, এঙ্গেলস, মর্গান প্রমুখ)

নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণাতে লক্ষ্য করা গেছে সকল সমাজেই নারী-পুরুষের কাজ কর্মের মধ্যে ভিন্নতা আছে। এর মানে হ'ল খাদ্য উৎপাদনের কাজে পুরুষের কিছু স্বতন্ত্র দায়িত্ব আছে আর নারীর কিছু স্বতন্ত্র দায়িত্ব আছে। উৎপাদনের কাজে নারী ও পুরুষের দায়িত্বের বিভাজনকে **লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন** বলা হয়। যে সব সমাজকে শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজ বলা হয়ে থাকে সেখানে প্রায়শই পুরুষরা শিকারী এবং নারীরা সংগ্রহকারী। এর মানে হচ্ছে শিকারের কাজ কিছু পুরুষরা করে থাকেন এবং নারীরা এবং অন্যরা – যেমন বয়স্করা, বাচ্চারা ফলমূল সংগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু এই ধারণার বিপরীতে নানান উদাহরণও আছে। যেমন: **হাডজা** এবং ভারতের **পলিয়ান**দের মধ্যে পুরুষরা নিজেদের জন্য বৃক্ষজাত খাদ্য সংগ্রহ করে থাকেন। আর নারীরা নিজেদের এবং বাচ্চাদের জন্য একই খাদ্য সংগ্রহ করে থাকেন। আবার যেখানে শিকার একটা যৌথকাজ হিসেবে বিবেচিত সেখানে দেখা যায় ভিন্ন ব্যাপার। যেমন: **মবুতি**দের

*উৎপাদনের কাজে নারী ও পুরুষের দায়িত্বের বিভাজনকে ***লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন*** বলা হয়।*

মধ্যে নারী ও পুরুষরা একত্রে জন্তু জানোয়ারকে তাড়া করে শিকারের এলাকাতে নিয়ে যায়। অবশ্য বৃহৎ জন্তুর বেলায় সেটা শিকারের দায়িত্ব পুরুষরাই পালন করে থাকে। উদ্যান-কৃষির সমাজেও নারী পুরুষের শ্রম বিভাজনের নজির পাওয়া যায়। কোন কোন গবেষণাতে দেখা গেছে, পুরুষরা জমি সাফ করার কাজটা সাধারণত করে থাকেন। আর চাষবাসের কাজটা নারী পুরুষ একত্রে করেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় নারীরাই প্রধান খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। যেমন: নিউ গিনিতে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মিষ্টি আলু উৎপাদন করে থাকেন নারীরা। পুরুষরা সেখানে উৎপাদন করেন চিনি, কলা যেগুলো অন্যত্র বিনিময় করা হয়। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সাধারণভাবে উৎপাদনের প্রাথমিক কাজগুলো পুরুষরা করে থাকেন। আর উৎপাদন প্রক্রিয়াজাত করণ সমেত রান্না-বান্না ইত্যাদি কাজ নারীরা করে থাকেন। তবে এই চিত্রের সাধারণ কোন প্রমাণ নেই।

কাজের ভিন্নতা দিয়ে সমাজে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ বুঝতে যাওয়া ঠিক হবে না। ভেদাভেদ বলতে এখানে সুযোগ-সুবিধার বঞ্চনা বোঝানো হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষিতেও উৎপাদন কাজে নারীরা ব্যাপকভাবে অংশ নিয়ে থাকেন। পাশাপাশি রান্না-বান্নার পুরোটাই এবং ফসল প্রক্রিয়াজাত করণের পুরোটাই তাঁদের উপর গিয়ে বর্তায়। এভাবে নানা উদাহরণ দিয়ে দেখানো সম্ভব যে বিভিন্ন সমাজে নারী ও পুরুষের কাজ আলাদা আলাদা থাকে। কিন্তু এ দিয়ে কোন কিছু বুঝতে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ কোন একটা সমাজে যেটা নারীদের কাজ অন্য সমাজে সেটাই হয়তো পুরুষের কাজ। যেমন: সূতোতে বোনার কাজটা আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমের জাতিসমূহের মধ্যে নারীরা করেন, কিন্তু আফ্রিকাতে পুরুষরাই করে থাকেন। আবার ভারত, মধ্য আফ্রিকাতে মাটির পাত্র বানাবার কাজটা পুরুষের এবং পশ্চিম আফ্রিকা কিংবা আমেরিকান ভূখন্ডের আদিবাসীদের মধ্যে এটা নারীদের কাজ। অধিকাংশ অ-ইউরোপীয় সমাজ বা প্রথম যুগের নৃবিজ্ঞানীদের ভাষায় *সরল* সমাজে বাচ্চা দেখাশোনার কাজ মায়েরা যেমন করে থাকেন, তেমনি তা অন্যদের অবসরের কাজও বটে। বয়স্ক লোকজন, একটু বেশি বয়সের বাচ্চারা কিংবা জোয়ান পুরুষরা যাঁরা উৎপাদন কাজে যাচ্ছেন না তাঁরা যে কেউই এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বরং অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীই এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে এই সব সমাজে আর্থিক এবং ক্ষমতার দিক থেকে কোন উঁচু-নিচু ভেদ ছিল না। ফলে কাজের ভিন্নতা দিয়ে সমাজে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ বুঝতে যাওয়া ঠিক হবে না। ভেদাভেদ বলতে এখানে সুযোগ-সুবিধার বঞ্চনা বোঝানো হচ্ছে।

উৎপাদনের সিংহভাগ কাজই নারীরা করে থাকেন অধিকাংশ সমাজে। আর ঘর-গেরস্তালির কাজ প্রায় পুরোটাই, বিশেষ করে বর্তমান সমাজে।

কোন কোন তাত্ত্বিক যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে নারীরা শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ায় সমাজে কাজ-কর্মের এই হেরফের, এবং এ কারণেই নারী পুরুষের তুলনায় বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে। কিন্তু এই যুক্তি খুবই একপেশে এবং দুর্বল। প্রথমত, শারিরীকভাবে প্রাণীকূলের মধ্যে মানুষের চেয়ে বলশালী অনেক প্রাণী আছে। আর তাছাড়া বহু সমাজে নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকেই এমন প্রমাণ মিলেছে যে সমাজে নারীরা মোট কাজের বেশির ভাগ করে থাকেন। আরেক ধরনের যুক্তি হচ্ছে নারীরা ঐতিহাসিকভাবে বাচ্চা লালন-পালনের সাথে যুক্ত বলে এবং বাচ্চা হওয়ার সময়ে লম্বা বিরতি দিতে হয় বলে নারীরা 'কম' গুরুত্বের কাজগুলো করে থাকেন এবং সে কারণে সমাজে তাঁদের বঞ্চনা। এই যুক্তিরও বড় ধরনের দুর্বলতা আছে। প্রথমত, নারীরা যে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন তা নয়। বরং, আগেই আলোচিত হয়েছে, উৎপাদনের সিংহভাগ কাজই তাঁরা হরে থাকেন অধিকাংশ সমাজে। আর ঘর-গেরস্তালির কাজ প্রায় পুরোটাই, বিশেষ করে বর্তমান সমাজে। বরং দেখা যায়, নারীর কাজকে অল্প গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, বহু সমাজেই বাচ্চা পেটে নিয়ে নারীরা কাজ করে থাকেন। আর বর্তমান কালে বাচ্চা হওয়া কমানোর প্রক্রিয়াতেও নারীর নিপীড়ন চলছে। পরিবার পরিকল্পনার যাবতীয় পদ্ধতি, বিশেষভাবে যেগুলো রাসায়নিক, চরম একপেশে যেমন ধরুন জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি যার থাকতে পারে বিভিন্ন রকমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এ সমস্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সহজেই বোঝা যায় সমাজে নারী পুরুষের ভেদাভেদ বা বৈষম্যের উৎস অন্য কোথাও। সমকালীন নগর সমাজের বাস্তবতার দিকে তাকালে সেটা আরও সহজে বোঝা যায়।

বর্তমান কালের লিঙ্গীয় বৈষম্য

বর্তমান কালে নারী-পুরুষের বৈষম্যের কতগুলি স্পষ্ট দিক খেয়াল করা যায়। আগেই আলোচনা করেছি যে, অ-ইউরোপীয় সমাজে বৈষম্যের উপাদান কম ছিল। পক্ষান্তরে, বর্তমান সমাজে নানাবিধ সম্পদ ও সুবিধা থাকাতে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের উপকরণ হিসেবে সেগুলি কাজ করে। বর্তমান কালে গেরস্তালির কাজের বাইরে সকল কাজই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে করে থাকেন। শিল্প উৎপাদনের জন্য নারী শ্রমিক এখন নিয়মিত ব্যাপার। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প এর ভাল উদাহরণ হতে পারে। এছাড়া নির্মাণ শিল্পে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ আছে। কিন্তু নারীর প্রতি বৈষম্য আর নিপীড়নও সমান তালে চলছে। প্রথমেই মজুরির কথা বলা যায়। গার্মেন্টস কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা নারী শ্রমিকের মজুরি পুরুষ অপেক্ষা কম। অনেক গবেষণায় দেখা যায় নারীকে কম মজুরি দেবার ইচ্ছে থেকেই অনেক শিল্পে নারীকে বেশি করে নিয়োগ দেয়া হয়। এ ছাড়া কর্মক্ষেত্রে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয় নারীকে। এমনিতেই শ্রমিক শ্রেণীর কাজের পরিবেশ নিশ্চিত নেই। ফলে নানা ধরনের হয়রানির মুখোমুখি হয় শ্রমিকেরা। কিন্তু নারীর জন্য বাড়তি নিপীড়ন হচ্ছে যৌন হয়রানি। এর মধ্যে থেকেই কাজ করতে হয় নারী শ্রমিককে। কিন্তু রোজগার করার কারণে নারী তাঁর ঘর-গেরস্তালির কাজ হতে মুক্তি পান না। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজ করে তাঁকেই আবার রান্না-বান্না, বাচ্চা দেখা শোনা কিংবা অন্যদের সেবা যত্ন করতে হয়।

নারীরা
পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার
অর্ধেক,
সমগ্র কর্মঘন্টার প্রায় **দুই-তৃতীয়াংশ** সময়
তাঁদের কাজ করতে হয়,
তাঁরা রোজগার করেন পৃথিবীর মোট আয়ের
এক-দশমাংশ,
এবং পৃথিবীর ধন-সম্পদের
এক-শতাংশের ও কম আছে তাঁদের আয়ত্তে।

সূত্র : ইউনাইটেড নেশনস রিপোর্ট, ১৯৮০

শিক্ষিত এবং স্বচ্ছল শ্রেণীর নারীদের বাস্তবতা কিছুটা ভিন্ন। সকল ধরনের পেশাতেই নারীরা কাজ করছেন। চাকুরিতে নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো থাকাতে মজুরির নিপীড়ন এক্ষেত্রে ঘটে না। এখানে প্রাথমিক বৈষম্য কিছুটা ঘোরানো পথে হয়ে থাকে। অনেক চাকুরিতেই নিয়োগ দেবার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যদিও হয়তো নিয়োগ বিধিতে উভয় লিঙ্গকে সমান প্রাধান্য দেবার কথা বলা আছে। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গর্ভকালীন ছুটির কোন নিশ্চয়তা না থাকলেও উঁচু চাকুরিতে আছে। তবে গর্ভকালীন ছুটি নিতান্ত কম।

অনেক চাকুরিতেই নিয়োগ দেবার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যদিও হয়তো নিয়োগ বিধিতে উভয় লিঙ্গকে সমান প্রাধান্য দেবার কথা বলা আছে।

নারী চাকুরি করুন বা নাই করুন স্বচ্ছল নারীদেরকেও ঘর-গেরস্তালির কাজ, বাচ্চাদের দেখাশোনা বা লেখাপড়া করানো, অন্যদের – বিশেষভাবে স্বামীকে দেখাশোনা করার কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে না করতে চাইলে সেটা খুব নিন্দনীয় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সেই নারী 'মন্দ' বলে সাব্যস্ত হন। নানা রকম হয়রানির আতঙ্ক এই শ্রেণীর নারীদের কর্মক্ষেত্রেও রয়েছে। পত্র-পত্রিকায় সে ব্যাপারে প্রচুর প্রতিবেদনও প্রকাশ পায়।

নারী-পুরুষ অসমতার একটা প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ঘরের কাজ। এতে পুরুষের প্রায় কোন ধরনের অংশগ্রহণ থাকে না।

বর্তমান সমাজে স্বচ্ছল বা শ্রমিক উভয় শ্রেণীতেই বিয়ের মধ্যেও নারী-পুরুষের ভেদাভেদ বা বৈষম্য বোঝা যায়। উভয় শ্রেণীতেই যৌতুক দিয়ে নারীদের বিয়ে হয়। তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় যৌতুক কেবল দরিদ্র মানুষের মধ্যেই প্রচলিত। আসলে স্বচ্ছল মানুষজন যৌতুককে উপহার বলে চালিয়ে থাকেন। যৌতুকের কারণে শারীরিক নির্যাতন উভয় ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। নারী-পুরুষ অসমতার একটা প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ঘরের কাজ। এতে পুরুষের প্রায় কোন ধরনের অংশগ্রহণ থাকে না। বলা হয়ে থাকে পুরুষ রোজগার করে আর নারী সংসার চালায়। কিন্তু শহুরে স্বচ্ছল শ্রেণীতে এখন এই কথাটা খুব একটা খাটে না। নারীরাও সেখানে রোজগার করেন।

তাছাড়া ঘরের কাজের যদি মজুরি হিসাব করা হয় তাহলে পুরো চিত্রটা একেবারেই বদলে যাবে। এখানে একটা প্রসঙ্গ লক্ষ্য করবার আছে। ঘরের কাজে যাবতীয় প্রকারে নারী শ্রম দিয়ে যাবেন। কিন্তু এই শ্রমকে অনুৎপাদনশীল মনে করা হয়। গৃহকাজে নারীর শ্রমের কোন মজুরী হিসেব করা হয় না এবং একে হালকা করে দেখা হয়। এভাবে নানান বস্তুগত উপায়ে নারীর উপর নিপীড়ন আছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনেও নারীর প্রতি বৈষম্য করা হয়ে থাকে। কোন কারণে বিয়ে ভেঙ্গে গেলে বাচ্চাদের ওয়ারিশ নিয়ে প্রচলিত আইন এবং সামাজিক অনুশীলন নারীর বিপক্ষে যায়।

বস্তুগত নানাবিধ নিপীড়নের পাশাপাশি আরেকটা বৈষম্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে: নারীকে নিরন্তর অবমূল্যায়ন করা হয়। নারীর কাজ, চিন্তা, জীবন সব কিছুকে উপেক্ষা করা হয়। এই অবমূল্যায়ন বা অমর্যাদাকে বিশে- ষণ করলে দেখা যায় এটা দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন। সত্যিকার অর্থে এই উপেক্ষা করে থাকেন পুরুষেরা। তবে সমাজে একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠলে তাতে নারীরাও সামিল হয়ে যেতে পারেন। তাই অনেক সময় দেখা যায় নারীর বিরুদ্ধে নারীও পদক্ষেপ নিয়ে বসতে পারেন। এ কারণে দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরুষের না বলে পুরুষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়ে থাকে। সংক্ষেপে পুরুষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে: **যে চিন্তা দ্বারা নারীকে অক্ষম মনে করা হয়, নারীর প্রতি আক্রমণাত্মক পরিবেশ তৈরি করা হয় এবং নারীকে যাবতীয় সুবিধার বাইরে রাখার ব্যাখ্যা তৈরি করা হয়**। গত তিন দশকে এই সব ভাবনা-চিন্তা নিয়ে শক্তিশালী নারী আন্দোলন গড়ে উঠেছে সারা পৃথিবীতে। এই আন্দোলন একদিকে সমাজে নারী-পুরুষের যে বস্তুগত অসমতা আছে (অল্প মজুরি, সম্পত্তি ভাগ, উত্তরাধিকার আইন, যৌন হয়রানি, যৌতুক ইত্যাদি) তার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির (উপেক্ষা, গেরস্তালির কাজে পুরুষের অংশ না নেয়া, আক্রমণাত্মক পরিবেশ গড়ে তোলা) বিরুদ্ধে। নারী আন্দোলনের কর্মীরা এবং চিন্তকগণ নারীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পরিবেশ নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়েছেন এবং আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়েছেন। এ কথা ঠিক যে ধর্ষণ বা এসিড নিক্ষেপ আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির সবচেয়ে ভয়ানক উদাহরণ। কিন্তু নারীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব আরও সূক্ষ্ম চোখে দেখার প্রয়োজন আছে। প্রচার মাধ্যমে নারীকে যেভাবে উপস্থাপনা করা হয় সেটা ভেবে দেখা যেতে পারে। এমনকি ঈদের পত্রিকাতে যে সব কার্টুন আঁকা হয় সেখানেও নারীকে লোভী, গয়না পিপাসু হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। এতে আড়াল হয়ে যায় কিভাবে নারী সংসার চালাবার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে আসছেন। অন্য লিঙ্গের প্রতি পুরুষবাদী সমাজের মনোভাবের আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে হিজড়া সমাজ। তাঁদের জীবনের অবহেলা, আয়ের কোন পথ না থাকা এবং সর্বোপরি মর্যাদা না থাকা দেখে আমরা বুঝতে পারি আমাদের বর্তমান সমাজ কতটা একলিঙ্গবাদী – আর সেই লিঙ্গ হচ্ছে পুরুষ। ফলে পুরুষবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বদল না ঘটলে নারী-পুরুষের সমতার পুরো লক্ষ্য অর্জিত হবে না। পুরো লক্ষ্য অর্জন হওয়া কেবল আইন বা আয় উপার্জন দিয়ে হবার নয় – সে কথাই নারী আন্দোলনের কর্মী এবং চিন্তকেরা বলছেন।

গত তিন দশকে ... শক্তিশালী নারী আন্দোলন গড়ে উঠেছে সারা পৃথিবীতে। এই আন্দোলন একদিকে সমাজে নারী-পুরুষের যে বস্তুগত অসমতা আছে ... তার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে।

সারাংশ

অধিকাংশ সমাজেই নারী-পুরুষের মধ্যে নানান ধরনের সামাজিক বৈষম্য রয়েছে। তা নিয়ে সমাজ-চিন্তক এবং নৃবিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন। প্রথম দিকের নৃবিজ্ঞানীরা মনোযোগ দিয়েছেন উৎপাদন কাজে নারীদের অংশগ্রহণ, সম্পদের উপর তাঁদের অধিকার এবং মান-মর্যাদার উপর। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেছেন এক সময়ে পৃথিবীতে নারীকেন্দ্রিক সমাজ ছিল। গত ৩/৪ দশক ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন

প্রান্তে নারীদের লড়াই-সংগ্রাম জোরাল ছিল। এতে নৃবিজ্ঞান সহ অন্যান্য জ্ঞানকান্ডে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে যুক্তি-তর্ক নতুন রূপ পেয়েছে। কেবল সম্পদের উপর দখল নয়, সমাজে যে ভাবনা-চিন্তা, মূল্যবোধ চালু সেটাও নারীর বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল বলে গবেষকরা দেখাচ্ছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘ রিপোর্ট অনুসারে নারীরা পৃথিবীর মোট আয়ের কত শতাংশ আয় করেন?

ক. এক শতাংশ　　খ. এক-দশমাংশ
গ. এক-তৃতীয়াংশ　　ঘ. অর্ধেক

২। নিচের কোন চিন্তাবিদ মনে করতেন যে, সমাজে একসময় মাতৃ-অধিকার ছিল?

ক. ব্যাকোফেন　　খ. মর্গান
গ. এঙ্গেলস　　ঘ. উপরের সবাই

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। লিঙ্গ বলতে আপনি কী বোঝেন?
২। নারী আন্দোলন কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন কী – উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।
২। বাংলাদেশে লিঙ্গীয় অসমতার ধরন আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

বয়সের ভিত্তিতে বিভাজন
Differentiation by Age

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- অ-ইউরোপীয় সমাজে বয়সের ভিত্তিতে সামাজিক সংঘ ছিল
- সামাজিক কাজকর্মের পরিচালনায় বয়স ভিত্তিক সংগঠনের গুরুত্ব ছিল
- আধুনিক সমাজে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় বয়সের বিভাজন কাজ করে

*অনেক জাতির মধ্যে বয়সের ভিত্তিতে বিভাজন লক্ষ্য করা গেছে। একে বলা হয় **বয়স বর্গ** (age grade)।*

বলা হয়ে থাকে বয়সের ভিত্তিতে বিভাজন পৃথিবীর সকল জাতিতে এবং সকল কালে বজায় আছে। অর্থাৎ সমাজের মানুষের মধ্যে সকল সমাজেই বয়সের ভাগ আছে। সাধারণভাবে এই ভাগ হচ্ছে: অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বয়স্ক এবং বয়োবৃদ্ধ। কিন্তু সকল জাতি আর সকল কালে এই বিভাজনের মানে কোনমতেই এক নয়। সাধারণভাবে নৃবিজ্ঞানের আলাপ-আলোচনায় অ-ইউরোপীয় সমাজের বয়স বিভাজন বেশি করে এসেছে। প্রধানত আফ্রিকা, আমেরিকার আদিবাসী জাতিসমূহ নিয়ে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। অনেক জাতির মধ্যে বয়সের ভিত্তিতে বিভাজন লক্ষ্য করা গেছে। একে বলা হয় **বয়স বর্গ** (age grade)। এক একটি বর্গে সকল সদস্যরা একটি বয়স সীমার মধ্যে হয়ে থাকেন। এই বর্গে ঢুকতে পারাটা প্রায় ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার ব্যাপার নয়। কোন একজন একটা নির্দিষ্ট বয়সে উত্তীর্ণ হওয়ার মানে তিনি আপনা আপনিই সেই বয়সের নির্দিষ্ট বর্গের সদস্য হয়ে যাবেন। যেমন : পূর্ব আফ্রিকার **তিরিকি** জাতির মধ্যে। তবে এসব ক্ষেত্রে কোন কোন জাতির মধ্যে নির্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠানের রেওয়াজ আছে। যেমন: উত্তর-আমেরিকার অনেক আদিবাসী জাতিসমূহের মধ্যে কোন কিশোর তার বয়স বর্গে ঢুকতে চাইলে অবশ্যই কিছু প্রথা মেনে নিতে হবে। তার নির্দিষ্ট পোশাক পরতে হবে, আর নাচ-গানে অংশ নিতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ মন উল্লেখ পাওয়া যায় যে নির্দিষ্ট বয়স বর্গে প্রবেশ করবার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে বেশ খরচ হয়। ফলে সমাজের কোন কোন সদস্যের পক্ষে সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢোকা সম্ভব হয় না।

বয়স সেট ... এমন একটা সামাজিক সংগঠন যেখানে একদল মানুষ সম-বয়সের এবং একই লিঙ্গের হয়ে থাকেন এবং সারা জীবন কিংবা জীবনের একটা বড় সময় একই সঙ্গে অতিবাহন করেন।

নির্দিষ্ট বয়স বর্গে ঢুকবার জন্য কতকগুলি ব্যক্তিগত অর্জন থাকতে পারে। সেটা জৈবিক হতে পারে – যেমন সাবালগ হওয়া, আবার সামাজিক হতে পারে – যেমন বিয়ে করা, বা বাচ্চা জন্মানো। বয়স বর্গের সদস্যদের অনেক কিছুই এক রকম হতে পারে, তাঁদের কাজ-কর্ম এক ধরনের হতে পারে, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক থাকতে পারে, এমনকি একই ধরনের উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে – কিন্তু একই বর্গের সদস্যদের বয়স আক্ষরিক অর্থে এক নয়, একটা সীমার মধ্যে তাঁদের বয়স। বয়স বর্গ (age grade)-এর পাশাপাশি আরেকটি ধারণা নৃবিজ্ঞানে ব্যবহার করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে বয়স সেট (age set)। বয়স সেট বলতে বোঝানো হয়ে থাকে এমন একটা সামাজিক সংগঠন যেখানে একদল মানুষ সম-বয়সের এবং একই লিঙ্গের হয়ে থাকেন এবং সারা জীবন কিংবা জীবনের একটা বড় সময় একই সঙ্গে অতিবাহন করেন। যেমন: পূর্ব আফ্রিকার **তিরিকি**দের মধ্যে একটা বয়স বর্গের সেই সব সদস্য যাঁরা ১৫ বছরের মত একত্রে কাটিয়েছেন তাঁদেরকে একটা বয়স সেটে গণ্য করা হয়। অনেকেই এটাকে বয়স বর্গের একটা অংশ হিসেবে দেখেছেন। কারণ বয়স সেটের সদস্যরা সকলে একই বয়স বর্গের হয়ে থাকেন। তবে একটা সাধারণ পার্থক্য হচ্ছে বয়স সেট সাধারণত একই লিঙ্গের সদস্যদের দ্বারা গঠিত। আর এর সদস্যরা পরস্পরের খুব ঘনিষ্ট থেকে যান সারা জীবন বা জীবনের বড় একটা সময়। তবে কোন কোন নৃবিজ্ঞানীর মতে এই ধরনের বয়স সেট বয়স বর্গের তুলনায় ক্ষমতার বিচারে স্বতন্ত্র। অনেক সমাজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নেতৃত্ব দেবার ব্যাপারে এই ধরনের বয়স সেট হস্তক্ষেপ করতে পারে। কোন কোন সমাজে বয়স সেট জ্ঞাতি সম্পর্কের বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এই ব্যাপারটা সাধারণ বয়স বর্গের থেকে একেবারেই ভিন্ন। বয়স বর্গের ব্যাপারটা ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকে যখন এর সদস্যরা বয়স্ক হতে থাকেন।

কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাধারণত এক বর্গের সদস্যরা অন্য বর্গে প্রবেশ করেন। বয়স্কবর্গের লোকজন সাধারণত স্পষ্টভাবেই নিজেদের আলাদা মনে করে

থাকেন, এবং একই সঙ্গে তাঁরা কিছু দায়িত্বও বোধ করে থাকেন তাঁদের 'কনিষ্ঠ'দের প্রতি – কিন্তু এর মানে এই নয় যে বয়স্করা কিংবা বয়োকনিষ্ঠরা কেউ কারো বর্গের চেয়ে 'ভাল' বা 'মন্দ'। নৃবিজ্ঞানীরা যে সকল সমাজকে সরল সমাজ বলেছেন সেখানকার বয়স বিভাজন সম্পর্কে এই রকম ব্যাখ্যাই অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, কোন একটা বয়সের বর্গকে ভাল বা মন্দ ভাবা আধুনিক কালের এবং আধুনিক সমাজে সৃষ্টি হয়েছে। অ-ইউরোপীয় সমাজে এই বর্গগুলো দিয়ে সমাজের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাগাভাগি করে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে কোন বর্গকে খাটো করে দেখা হয়নি। তবে কোথাও কোথাও বয়স ভিত্তিক দলের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক এবং সামরিক দায়-দায়িত্ব দেয়া থাকে। যেমন: পূর্ব আফ্রিকার **কারিমোজোং**, **মাসাই** এবং **নান্দী** জাতি। এখানে দুই একটা সমাজের উদাহরণ ধরে বয়স ভিত্তিক বিভাজনের চর্চা দেখা যেতে পারে।

আফ্রিকার সমাজে বয়স ভিত্তিক বিভাজন

নৃবিজ্ঞানীদের মতে আফ্রিকাই বয়স ভিত্তিক বিভাজনের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ। এখানেই নানাবিধ ধরনে বয়সের সংঘ ধরা পড়েছে নৃবিজ্ঞানীদের কাছে। ই. ই. ইভান্স প্রিচার্ড **নুয়ের** সমাজের বয়স বিভাজন নিয়ে আলোচনা করেছেন (১৯৪০)। প্রিচার্ডের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সমস্ত সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত পূর্ব আফ্রিকার নুয়ের সমাজে যে কোন পুরুষের সঙ্গে অন্য সকল পুরুষের অবস্থানের তুলনা চলে। আর সেই তুলনাটা চলে বয়োজ্যেষ্ঠতা, সমবয়স এবং বয়োকনিষ্ঠতা দিয়ে। এভাবেই নুয়ের সমাজের একদম ভিত্তির ব্যাপার এটা। নতুন বর্গে অভিষেক ঘটানো কোন কাগজে-কলমে লেখাপড়ার ব্যাপার নয়। একজন ছেলে তাঁর বাবার কাছ থেকে কিংবা চাচার কাছ থেকে যদি কোন অস্ত্র লাভ করেন, তাহলে এর মধ্য দিয়ে তিনি যোদ্ধাতে পরিণত হন। তাঁকে যদি একটা ষাঁড় দেয়া হয় তিনি রাখাল বা পশুচারক হয়ে যান। এভাবে তিনি বয়স্ক পুরুষ হবার স্বীকৃতি পেলেন। একবার যখন তিনি এই কাজে অভিষিক্ত হলেন, সারা জীবনই সেই বয়স বর্গের সদস্য হয়ে রইলেন। তাঁর এই নতুন মর্যাদার কারণে তিনি কোন প্রশাসনিক কিংবা রাজনৈতিক-সামরিক কর্তৃত্ব পেলেন না, কিন্তু স্বীকৃতি পেলেন। কেবল একটা নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে যে, তিনি দুধ দোয়াতে পারবেন না। এ ছাড়া তিনি ঘর-গেরস্তালির কাজে অংশ নেবেন কতটা তাও খুবই শিথিলভাবে বলা থাকে। অন্তত তাঁর বিয়ে অব্দি। কিছু নীতিমালা অবশ্যই থাকে। যেমন: কোন পুরুষ তাঁর সমবয়সী দলের কোন সদস্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করতে পারবেন না, কোন সম্পর্ক রাখাও সম্ভব নয়। যেহেতু মেয়েটি তাঁর 'মেয়েতুল্য'। পুরুষ হয়ে ওঠার সাথে সাথেই কারো আচার-আচরণ এবং খাবার দাবারের কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তন হবে। এটা তাঁকে কোন সুযোগ দেবার জন্য নয়, নিয়ম।

নুয়ের সমাজের ... একজন ছেলে তাঁর বাবার কাছ থেকে কিংবা চাচার কাছ থেকে যদি কোন অস্ত্র লাভ করেন, তাহলে এর মধ্য দিয়ে তিনি যোদ্ধাতে পরিণত হন। তাঁকে যদি একটা ষাঁড় দেয়া হয় তিনি রাখাল বা পশুচারক হয়ে যান।

বিস্তারিত বয়স বিভাজনের প্রসঙ্গে পূর্ব নাইজেরিয়ার **আফিকপো ইবো**-দের কথা বলা যায়। সেখানে প্রত্যেকটা আফিকপো গ্রামে পুরুষদের একটা সংগঠন দেখা গেছে – *ওগো।* সকল বয়োপ্রাপ্ত পুরুষরা সমাজের সকল ধর্মীয়, নৈতিক এবং মনোরঞ্জনের অনুষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। একই সঙ্গে তাঁরা গ্রামবাসীর আচার-আচরণের নীতিমালাও বানিয়ে থাকেন। এই সমাজে বয়স সেটও বেশ গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। একই গ্রামে মোটামুটি তিন বছরের ব্যবধানে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের নিয়ে এই সেট গঠিত। নারী এবং পুরুষদের সেট আলাদা, তবে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করে থাকেন। এই সেটগুলোর একেবারে স্বতন্ত্র দায়িত্ব পড়ে যখন কোন ভোজ বা উৎসব দেখা দেয়। বয়স বর্গ হচ্ছে এই ধরনের বয়স সেটের একটা সম্মিলিত রূপ। এর অনেকগুলি সামাজিক-অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব আছে। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং জবাবদিহিতার সম্পর্ক রয়েছে এই বয়স বর্গের সদস্যদের। বয়স সেট সাধারণভাবে গ্রামের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, আর বয়স বর্গ গ্রামের এবং অনেক গ্রামের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। নারীদের বয়স সেটগুলোকে পুরুষদের তুলনায় দুর্বল বলে মনে করেছেন গবেষক নৃবিজ্ঞানীরা। কিশোরী মেয়েদের সমবয়সী দল আছে। তবে সাধারণত বিয়ের পর বিবাহিত মেয়েদের সমবয়সী সংঘই তৎপর। ১৯৪০ সাল থেকে সেখানে গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন এবং গ্রামীণ ইউনিয়নও গড়ে উঠেছে।

***আফিকপো ইবো**দের মধ্যে ... সকল বয়োপ্রাপ্ত পুরুষরা সমাজের সকল ধর্মীয়, নৈতিক এবং মনোরঞ্জনের অনুষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব নিয়ে থাকেন।*

কারিমোজোং-দের বয়স সেট থেকে দেখা যায় এখানে জ্ঞাতি সম্পর্কের ঊর্ধ্বে কাজ করে এই সংঘ। এরা উগাণ্ডার একটা জাতি। এখানে এক একটা প্রজন্মে ৫টি করে বয়স সেট থাকে। পুরুষদের প্রজন্মের এই ৫টি বয়স সেট তৈরি হয়ে গেলেই তাঁরা তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্তাদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেয় এই প্রজন্ম বা বয়স বর্গ। এভাবে একটি প্রজন্ম যাঁরা প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন. বিচার কাজ পরিচালনা করতেন – তাঁরা কার্যত অবসরপ্রাপ্ত হয়ে গেলেন। এই সমাজে বয়স সেটের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্বীকৃত। ব্রাজিলের **শাভান্তে** জাতির মধ্যে আবার একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর ছেলেদেরকে 'আইবুড়োদের ঘরে' (bachelor hut) পাঠানো হয়ে থাকে। এখানে বছর পাঁচেক কাটানোর পর তাঁরা 'যুবক' হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারেন। ওই বাসস্থানে থাকতে থাকতেই শিখতে হবে কিভাবে অস্ত্র বানাতে হয়, কিংবা শিকার করতে হয়। এ রকম উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব নৃবিজ্ঞানের গবেষণা থেকে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজ ও জাতিতে বয়সের ভিত্তিতে বিভাজন দেখা যায়, একটা সমাজ থেকে আরেকটা একেবারেই ভিন্ন।

এই সব সমাজে ইউরোপীয় শাসন আসবার পর কি ধরনের বদল ঘটেছে তা নিয়ে তেমন একটা আলোচনা খুব কম নৃবিজ্ঞানী করেছেন। বিশেষত যাঁরা বয়স ভিত্তিক সংগঠন নিয়ে গবেষণা করেছেন।

নৃবিজ্ঞানের এই সব গবেষণা লক্ষ্য করলে দেখা যায় বয়স ভিত্তিক বিভাজনের বেলায় নামকরণ নিয়ে নানা বিভ্রান্তি আছে। বয়স সেট এবং বয়স বর্গ বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা সবক্ষেত্রে পরিষ্কার হয়নি, একটার সঙ্গে অন্যটার পার্থক্যও বোঝা কঠিন হয়। কোন কোন লেখায় বয়স ভিত্তিক বিভাজন না বলে বয়স ভিত্তিক সংগঠন হিসেবে বলা হয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট। এই সব সমাজে ইউরোপীয় শাসন আসবার পর কি ধরনের বদল ঘটেছে তা নিয়ে তেমন একটা আলোচনা খুব কম নৃবিজ্ঞানী করেছেন। বিশেষত যাঁরা বয়স ভিত্তিক সংগঠন নিয়ে গবেষণা করেছেন। ইউরোপের শাসনে সমাজের সর্বত্র বদলেছে। ফলে অনুমান করা যায় বয়স ভিত্তিক সংগঠন কিংবা বিভাজনের মধ্যেও মৌলিক বদল এসেছে। এ ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট করেছেন আরেক নৃবিজ্ঞানী তালাল আসাদ। তিনি সুদানের **ডিংকা** সমাজের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বুঝিয়েছেন। এই সমাজে গবেষণা করেন আরেক নৃবিজ্ঞানী লিয়েনহার্ট। লিয়েনহার্টের কাজ ধরে তালাল আসাদ বিশে- ষণ করেছেন কিভাবে ডিংকা সমাজের বয়সের বিভাজনে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করেছে। উপনিবেশ স্থাপনার আগে অর্থাৎ ডিংকা সমাজে বৃটিশ শাসন চালু হবার আগে এক বয়স বর্গ থেকে অন্যটায় উত্তরণ ছিল 'পাকা হয়ে ওঠা'। এর জন্য তাঁরা একটা শব্দ ব্যবহার করতেন – 'লো তোয়েং'। এর সামাজিক মানে ছিল অভিজ্ঞতা অর্জন করা, জ্ঞানী হয়ে ওঠা ইত্যাদি। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্য দিয়ে সমাজের মধ্যকার ধ্যান-ধারণায় এমন পরিবর্তন ঘটেছে যে বয়স বর্গের গুরুত্ব একেবারেই আগের মত থাকল না। আর ওই শব্দটার মানে বদলে গিয়ে দাঁড়াল 'প্রগতিশীল হয়ে ওঠা/আধুনিক হয়ে ওঠা'। বয়সের দিক থেকে বুজুর্গ হয়ে ওঠার আর কোন মানে থাকল না ওই সমাজে।

বাংলাদেশের বয়স ভিত্তিক বিভাজনের আচার-অনুষ্ঠান

বয়সের কোন একটা পর্যায়ে সামাজিক রীতিনীতি কিংবা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দু'চারটি উদাহরণ আমাদের সমাজ থেকেও দেয়া সম্ভব। একটা হচ্ছে উপনয়ন প্রক্রিয়া। সাধারণত বাংলা অঞ্চলের হিন্দু ব্রাহ্মণদের মধ্যে এর প্রচলন দেখা যায়, তবে কাছাকাছি ধরনের নিয়ম অন্যান্য অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও রয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরুষ সন্তান একটা নির্দিষ্ট বয়সে আসবার পর তাঁকে নিয়ে উপনয়ন অনুষ্ঠান হয়। এর চলতি নাম হচ্ছে 'পৈতে পরানো'। এই অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যরা আসেন। তবে সকলেই সাধারণত নিজ বর্ণ থেকে আসেন। এর নাম যাই হোক না কেন – সামাজিকভাবে এর মানে হচ্ছে পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই ব্রাহ্মণ 'বালক' অন্য স্তরে উন্নীত হন। এর অন্য মানেও আছে। যে সব ব্রাহ্মণ পূজা-অর্চণা করেন তাঁদের এই পৈতে প্রয়োজন পড়ে। ফলে এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির আগে কোন ব্রাহ্মণ পূজার মত কোন দায়িত্ব নিতে পারেন না।

'পৈতে পরানো'..র আ ব্রাহ্মণ পূজার মত কো নিতে পারেন না।

আরেকটা উদাহরণ দেয়া যায়। বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে কিছু লোকদেবীর আরাধনা প্রচলিত ছিল। এর অনেকাংশই বিশেষভাবে নিম্নবর্গীয় এবং নারীকেন্দ্রিক। যেমন: ভাদু দেবী। এই সব আরাধনার কিছু কিছু

নারীর শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। দক্ষিণাঞ্চলে এই রকম একটা দেবীর আরাধনার নজির ছিল নারীদের ঋতুস্রাব শুরু হলে। সাধারণভাবে গেরস্ত হিন্দু ঘরের মেয়েরা বয়োপ্রাপ্ত হলে লোকদেবীর আরাধনা করা ছাড়াও পাড়া-পড়শিকে খাওয়ানো হ'ত। একই সাথে শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপহার দিতেন এই 'নতুন' নারীকে। এই ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানের মূল মানে ছিল নারীর 'যৌবন প্রাপ্তি'কে সম্মান দেখানো। ক্রমশ এই ধরনের প্রচলন কমে আসছে সমাজে।

নগর সমাজে বয়সের বিভাজন ও বৈষম্য

শহরাঞ্চলে বয়সের বিভাজন ঘটে থাকে আইনের মাধ্যমে। প্রচলিতভাবে একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত নারী বা পুরুষ উভয়েই শিশু হিসেবে গণ্য হয়ে থাকেন। এই মুহূর্তে জাতিসংঘের মানদন্ড অনুযায়ী বয়সের সীমারেখাটি হচ্ছে ১৮ বছর। এই বয়সের পর কতকগুলি অধিকার স্বীকৃতি পায়। যেমন: ভোট দেয়ার অধিকার, কোন কিছু কেনার অধিকার ইত্যাদি। পশ্চিমা সমাজে এই বয়স হবার আরও কিছু সামাজিক মানে আছে। এই বয়সের পর আশা করা হয় সন্তানেরা বাবা-মার কাছ থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র জীবন যাপন করবেন। তাছাড়া এই বয়সের পর যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা আইনত দন্ডনীয় নয়। কিশোর-কিশোরী বয়স থেকে 'যুবক-যুবতী' হয়ে ওঠার মত নগর সমাজে প্রৌঢ়/বৃদ্ধ হয়ে ওঠার ব্যাপারটাও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে পুরুষদের মধ্যে একটা সময়ে চাকুরি বা কাজ থেকে অবসর নেবার চর্চা আছে। আশা করা হয় এই সময়ে তিনি বিশ্রাম নেবেন এবং তাঁর পুত্র সন্তানেরা ব্যবসা সামলাবেন কিংবা চাকুরি করে রোজগার করবেন। নারীদের গেরস্তালি কাজ থেকে অবসর নেয়ার সুযোগ থাকে না। পাশাপাশি লক্ষ্য করার মত কিছু ব্যাপার আছে। হাসি-ঠাট্টা এবং আলাপ-আলোচনার মধ্যেও বয়সের বিভাজন ধরা পড়ে। যেমন: 'এখন তো তুমি দাদা হয়েছ, তোমার কি এখন এসব মানায়?'

সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে বয়সের ভিত্তিতে কোন ভেদাভেদ বা বৈষম্য আধুনিক সমাজে নেই। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে এই ধারণাটা ভ্রান্ত। পরিবারে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় অল্প বয়সীদের কখনোই অংশ নিতে দেয়া হয় না। তাঁদের মতামত কিংবা ভাবনা-চিন্তাকে হাল্কাভাবে নেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে খাবার-দাবার কিংবা আসবাবপত্র ব্যবহারের বেলায়ও বঞ্চিত হয়ে থাকেন পরিবারের অল্প বয়সী সদস্যরা। এসব ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থাও পুরুষদের তুলনায় নিম্নমুখী। বাংলা ভাষায় সর্বনামের বেলায় দেখা যায় নিু শ্রেণীর মানুষের জন্য 'তুমি' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি অল্প বয়সীদের বেলায়ও তা করা হয়। বয়স ১৮ হওয়া মানেই এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে পারা নয়। প্রায়শই কাউকে ঘায়েল করার জন্য বলা হয় 'তুমি তো আমার হাঁটুর বয়সী।'

অল্প বয়সীদের ... মতামত কিংবা ভাবনা-চিন্তাকে হাল্কাভাবে নেয়া হয়।

বৈষম্যের এই চিত্র কেবল এখানেই সীমিত নয়। চাকুরি কিংবা পেশাগত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে একটা শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে – অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন নিয়োগকর্তাই বর্তমান নগর সমাজে চাকুরি দিতে চান না। কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ-সুবিধা সকলের একরকম না। বৈষম্য এখানেই। পেশাদার জগতে সাধারণত অভিজ্ঞতার কথা গর্বের সঙ্গে বলা হয়েও থাকে। এটা আধুনিক সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয় যে কোন সামাজিক প্রসঙ্গে মতামত দেয়া বা আলাপ-আলোচনার জন্য বয়স্ক এবং পুরুষদের বাড়তি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এখানে কোন তরুণ-তরুণী বা কিশোর-কিশোরীর তীক্ষ্ণ বিশে- ষণ থাকলেও তা চাপা পড়ে যায়। প্রচার মাধ্যমের যে সমস্ত কাজকে চিন্তাশীল ভাবা হয়ে থাকে তার প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব তুলনামূলকভাবে বয়স্ক পুরুষদের হাতে। তা সে টেলিভিশনই হোক আর পত্রিকার রাজনীতি-অর্থনীতি পাতাই হোক। বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাতে গুরুত্ব দিয়ে কিশোর-কিশোরীর ছবি ছাপা হয় কেবল মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে। সেখানেও তাঁদের সাফল্যের সঙ্গে অনিবার্যভাবে তাঁদের বাবা-মার ভূমিকার কৃতিত্ব দেয়া হতে থাকে। এগুলো কেবল কিছু উদাহরণ বয়স ভেদে বৈষম্যকে বোঝার জন্য।

চার মাধ্যমের যে সমস্ত ক চিন্তাশীল ভাবা হয়ে তার প্রায় একচেটিয়া তুলনামূলকভাবে বয়স্ক পুরুষদের হাতে।

বয়সে যাঁরা অনেক প্রবীণ তাঁদেরকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে বোঝা মনে করা হয়।

আধুনিক সমাজে বয়সের দিক থেকে অল্প বয়সীরাই যে কেবল বৈষম্যের শিকার তা নয়। এখানে বৃদ্ধরাও বৈষম্যের শিকার। সমাজের ঘটনাবলী তলিয়ে দেখলেই সেটা বোঝা যায়। বয়সে যাঁরা অনেক প্রবীণ তাঁদেরকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে বোঝা মনে করা হয়। প্রবীণদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করার সামাজিক প্রবণতা আছে। কেউ কেউ বলে থাকেন প্রবীণেরা যদি অনেক সম্পত্তিবান হন তাহলে এই পরিস্থিতি তৈরি হয় না। সেক্ষেত্রে সম্পত্তির ওজনে মানুষের মর্যাদা মাপা হচ্ছে। নারীরা এই পরিস্থিতিতে আরও করুণ অবস্থার মুখোমুখি হয়ে থাকেন। কারণ সামাজিকভাবে নারীর সম্পত্তির নজির কম। শহুরে বহু মধ্যবিত্ত পরিবারে অবসরপ্রাপ্ত এই মানুষজন নানাবিধ অবজ্ঞা আর চাপের মধ্যে থাকেন। সেই হিসেবে চিন্তা করলে দেখা যায় এই সমাজে গ্রহণযোগ্যতা আছে কেবল একটা নির্দিষ্ট বয়সের এবং অবশ্যই নির্দিষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতার পুরুষদের। কারণ তাঁরাই কেবল সমাজে অন্য শ্রেণীর, অন্য লিঙ্গের এবং অন্য বয়সের মানুষদের অবস্থান ঠিক করে দিতে পারেন। তাঁদের কথার মূল্যায়ন করতে পারেন, সঠিক-বেঠিক নির্ধারণ করতে পারেন, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এটা নিশ্চিতভাবেই বৈষম্য।

সারাংশ

বিশেষত ইউরোপের বাইরের সমাজে বয়স একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বয়সের ভিত্তিতে সমাজের মানুষজনের মধ্যে ভাগ করা হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট একটা বয়সের সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে। বয়স্ক মানুষজনের প্রজ্ঞা আর অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি থাকে এবং তাঁরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ে থাকেন। তবে সেক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্যকে খেয়াল রাখা দরকার। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে,শহুরে সমাজে বয়সের ভিত্তিতে মান-মর্যাদার ভেদবিচার নেই। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। বরং, এই সমাজে পেশাগত মর্যাদার ক্ষেত্রে অল্প বয়সীদের গুরুত্ব কম দেয়া হয়। একই সঙ্গে বয়স্ক অবসরপ্রাপ্তদের নানারকম অবহেলার শিকার হতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। বয়স ভিত্তিক বিভাজন -এর উদাহরন হিসেবে নৃবিজ্ঞানীরা কোন অঞ্চলকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন?

ক. এশিয়া　　খ. ইউরোপ

গ. আফ্রিকা ঘ. ল্যাটিন আমেরিকা

২। নৃবিজ্ঞানী ই. ই. ইভান্স প্রিচার্ড কোন সমাজের বয়স বিভাজন নিয়ে আলোচনা করেছেন?
ক. নুয়ের খ. নায়ার
গ. টোডো ঘ. আফিকপো ইবো

৩। 'লো-তোয়েং' - শব্দটি কোন সমাজে প্রচলিত?
ক. কারিমোজোং খ. শাভান্তে
গ. ডিংকা ঘ. নান্দী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বয়স বর্গ (age grade) বলতে কী বোঝানো হয়ে থাকে?
২। বয়সভিত্তিক সংগঠন কী বৈষম্যমূলক?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিভিন্ন সমাজে বয়সভিত্তিক সংগঠনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২। সাধারণভাবে অনেকেই বলে থাকেন আধুনিক সমাজে বয়সের ভেদাভেদ নেই। আপনার কি মনে হয়?

পাঠ - ৩

পদমর্যাদা-ভেদাভেদ
Rank-Hierarchy

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- পদমর্যাদা ভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য

- সমতা ভিত্তিক সমাজের সাথে এর পার্থক্য
- বর্তমান সমাজে স্তরায়নের ধরন

বৈষম্যের ভিত্তিতে তিন ধরনের সমাজকে চিহ্নিত করেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। সেগুলো হচ্ছে: সমতা ভিত্তিক সমাজ (egalitarian society), পদসোপানিক সমাজ (rank society) এবং শ্রেণী ভিত্তিক সমাজ (class society)।

এই ইউনিটের শুরুর দুই পাঠ থেকে আপনারা জানেন যে বয়স এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন সমাজে আছে। এই বিভাজন নানা সমাজে এবং নানা কালে বিভিন্ন রকম। আপনারা এও জেনেছেন যে, এই বিভাজন কখনো কখনো নিছক সংঘকেন্দ্রিক হলেও, কখনো কখনো দায়িত্ব ভাগ বণ্টন করে নেয়ার জন্য হলেও অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্যমূলক বা ভেদাভেদমূলক। অর্থাৎ, অনেক ক্ষেত্রেই এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে সদস্যদের কোন কোন অংশের প্রতি বঞ্চনা হয়ে থাকে। নৃবিজ্ঞানীরা সমাজে এই ভেদাভেদ বা বৈষম্য নিয়ে গোড়া থেকেই মনোযোগ দিয়েছেন। বৈষম্যের ভিত্তিতে তিন ধরনের সমাজকে চিহ্নিত করেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। সেগুলো হচ্ছে: সমতা ভিত্তিক সমাজ (egalitarian society), পদসোপানিক সমাজ (rank society) এবং শ্রেণী ভিত্তিক সমাজ (class society)। ভেদাভেদের ক্ষেত্রে কেবল বয়স বা লিঙ্গ কাজ করে তা নয়। কোন সমাজের সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য আছে কিনা কিংবা কিভাবে বৈষম্য কাজ করছে তা বোঝার জন্য নৃবিজ্ঞানীরা তিনটি ধারণা ব্যবহার করেছেন – আর্থিক সম্পদ, ক্ষমতা এবং মর্যাদা বা সম্মান। এগুলির ভিত্তিতেই সমাজের সদস্যদের মধ্যে ভেদাভেদ কাজ করে।

সমতা ভিত্তিক সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পদ, মর্যাদা এবং ক্ষমতার কোন ভেদাভেদ কাজ করে না।

সমতা ভিত্তিক সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পদ, মর্যাদা এবং ক্ষমতার কোন ভেদাভেদ কাজ করে না। নৃবিজ্ঞানীরা অবশ্য পরিষ্কার করেছেন, এর মানে এই নয় যে কোন ধরনের বাড়তি মর্যাদা কেউই লাভ করেন না এসব সমাজে। মূল ব্যাপার হচ্ছে এই ধরনের সমাজে কোন সদস্য সম্পদ, মর্যাদা বা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে পারেন না, কিংবা বেশি পরিমাণে দখল নিতে পারেন না। অবশ্যই সামাজিক মর্যাদার কতগুলি জায়গা আছে। যেমন: বিভিন্ন কাজে নানা ধরনের দক্ষতা থাকলে তা সেই সমাজের মধ্যে বাড়তি সম্মান বয়ে আনে। শিকার করা কিংবা অস্ত্র বানানো ইত্যাদি। এছাড়া অভিজ্ঞতার কারণে সম্মান পেতে পারেন মুরুব্বীরা। আবার কেউ যদি সুবক্তা হন, কোন একটা ব্যাপার স্পষ্ট করতে পারেন – তাঁকেও অন্য সদস্যরা কদর করে থাকেন। কিন্তু এ ধরনের সমাজে কোন সদস্যেরই বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় জিনিস পাবার ক্ষেত্রে অন্য কেউ বাধা দেন না। কেউ কাউকে শোষণ করা বা ঠকানোর চেষ্টা করেন না। জীবন ধারণের মৌলিক সব দ্রব্যই এখানে সকল সদস্য সমান ভাবে ভোগ করে থাকেন। সেটাই সামাজিক ব্যবস্থা। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই ধরনের সমাজকে সমতা ভিত্তিক সমাজ বলা হয়ে থাকে। এখানে বয়স বা লিঙ্গ ভিত্তিক সামাজিক সংঘ সাধারণত থাকে। কিন্তু সেগুলি কোনটার থেকে কোনটা বাড়তি সুবিধা নিয়ে জীবন যাপন করে না। কিংবা যাঁরা সমাজে নিজেদের দক্ষতা-যোগ্যতার কারণে বাড়তি সম্মান লাভ করেন – তাঁরা সেই সম্মানের জোরে কোন কিছু বাড়তি ভোগদখল করেন না।

এই ধরনের সমতা ভিত্তিক সমাজ নৃবিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন তাঁদের গবেষণার সময়কালে। প্রথম যুগের নৃবিজ্ঞানীরা *সরল সমাজে* গবেষণা করেছেন। এই সব সরল সমাজের বড় একটা অংশই সমতা ভিত্তিক ব্যবস্থাতে পরিচালিত হ'ত। ইউরোপীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবার আগে সেগুলো বজায়ও ছিল। নৃবিজ্ঞানীদের বর্ণনা মতে শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজের প্রায় সবগুলিতেই এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল। সমাজের সকল সদস্যদের খাদ্য ভাগাভাগি করে খাবার বাধ্যবাধকতা ছিল। আর কোন কিছুর উপরই কেউ কোন ধরনের স্থায়ী কোন দখল তৈরি করতে পারতেন না। তবে কিছু কিছু শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজ তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন যেখানে সমতা ভিত্তিক সমাজের বদলে পদসোপানিক সমাজ ব্যবস্থা চালু ছিল। যেমন: **ইনুইত**দের কিছু কিছু দলের মধ্যে সম্পদ জড়ো করবার প্রক্রিয়া তৈরি হচ্ছিল। যে সব দলের কাছে তিমি শিকার খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁদের কেউ কেউ নৌকা, হাতিয়ার ইত্যাদির মালিক হয়েছিল এবং শিকারে অন্যদের চেয়ে বাড়তি সুবিধা পেত। মার্কিন ভূখন্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় মৎসজীবী জাতির মধ্যেও সমতা ভিত্তিক সমাজ চালু ছিল না, পদসোপানিক ব্যবস্থা চালু ছিল।

কী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোন সমাজকে সমতা ভিত্তিক, পদসোপানিক কিংবা শ্রেণী সমাজ বলা হয়ে থাকে তা একটা ছকের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব। যদিও এই ছকের মাধ্যমে বিষয়টাকে যত সহজ করে ফেলা হয়েছে বাস্তবে সমাজ জীবনে বৈষম্য তার থেকে অনেক জটিল বিষয়। কিন্তু ছকটির মাধ্যমে বুঝতে সুবিধা হবে নৃবিজ্ঞানের বই-পুস্তকে সমাজের ভেদাভেদ নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ।

চিত্র - ১ : বিভিন্ন সমাজে সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদা

	সমাজের কোন অংশের কোন বিশেষ দখল আছে কিনা		
সমাজের ধরন	আর্থিক সম্পদ	ক্ষমতা	মর্যাদা/সম্মান
সমতা ভিত্তিক সমাজ	নেই	নেই	নেই
পদসোপানিক সমাজ	নেই	নেই	আছে
বর্ণ এবং শ্রেণী ভিত্তিক সমাজ	আছে	আছে	আছে

(এম্বার এবং এম্বার ১৯৯০)

পদসোপানিক ব্যবস্থা বলতে বোঝায় যে ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে মর্যাদার পার্থক্য থাকে। ... সদস্যরা পরস্পর মর্যাদার দিক থেকে ভিন্ন অবস্থানে থাকলেও তাঁদের মধ্যে সম্পদের মৌলিক কোন তারতম্য থাকে না।

পদসোপানিক ব্যবস্থা বলতে বোঝায় যে ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে মর্যাদার পার্থক্য থাকে। পদসোপানিক সমাজের সদস্যরা পরস্পর মর্যাদার দিক থেকে ভিন্ন অবস্থানে থাকলেও তাঁদের মধ্যে সম্পদের মৌলিক কোন তারতম্য থাকে না। যে সকল সমাজে নৃবিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন সেখানে চীফ বা প্রধানের পদ দেখা গেছে। তাঁর মর্যাদাও সমাজে স্বীকৃত। তিনি মহাভোজ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জিনিসপত্র পুনর্বণ্টন করে থাকতেন। এই দায়িত্বটা সমাজে খুব সম্মানজনক হিসেবে গণ্য। পুনর্বণ্টন বলতে একটা বিনিময় ব্যবস্থা আপনারা অর্থনৈতিক সংগঠন অংশে দেখতে পারবেন। যদিও এই সকল সমাজে চীফের পদ খুবই সম্মানজনক ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কোনভাবেই খাদ্য বা দ্রব্যাদি নিজের জন্য সঞ্চয় করে থাকেন না। জীবন যাপনের মৌলিক অর্থ কোনক্রমেই ভিন্ন নয় চীফ এবং সাধারণ মানুষজনের মধ্যে। পদসোপানিক সমাজে চীফ বা মুখিয়ার পদ অনেক মর্যাদাসম্পন্ন। কেবল তাই নয়, বরং জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মর্যাদার তারতম্য কাজ করে। চীফের সবচেয়ে কাছের আত্মীয় স্বজনেরা বংশানুক্রমিকভাবে বেশি মর্যাদা লাভ করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে জন্ম কার আগে হচ্ছে সেই বিচারেও মর্যাদার তারতম্য কাজ করতে পারে।

অধিকাংশ পদসোপানিক সমাজ পশুপালন এবং চাষবাসকেন্দ্রিক বলে জানা যায়। তবে কিছু সাধারণ পদসোপান অনেক শিকারী সমাজেও লক্ষ্য করেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। সবচেয়ে জটিল ধরনের পদসোপানিক ব্যবস্থা পাওয়া গেছে মার্কিন ভূখন্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের জাতিসমূহের মধ্যে। এসব সমাজের সদস্যদের অবস্থানের মধ্যে মর্যাদার ভেদাভেদ গভীরভাবে ঠিক করা থাকে। **নূটকা**দের মধ্যে সমস্ত আর্থিক সম্পদ দেখভাল করার দায়িত্ব থাকে আলাদা আলাদা। এই দায়িত্ব সব সময় বড় ছেলের উপর বর্তায়। মর্যাদার এই পার্থক্য ধরা পড়ে কিছু আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। যেমন: বিশেষ ভাবে নাম ব্যবহার করা, কোন একটা উৎসবে বিশেষ দায়িত্ব পালন, বিশেষ কোন পোশাক পরা ইত্যাদি। তবে কেবল চীফ বা মুখিয়াই কোন অলঙ্কার পরতে পারেন। কোন জ্ঞাতি দলের প্রধান আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের কারণে কিছু বাড়তি প্রতীকী সুবিধা পেতে পারেন। যেমন সামুদ্রিক কোন মাছের মুড়ো, কম্বল কিংবা পশম। এভাবে যে দ্রব্যগুলো পান সেগুলোই তিনি আবার 'পটল্যাচ' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেন। (পটল্যাচ প্রথার বিস্তারিত আলোচনা ইউনিট ৬-এর ৩নং পাঠে পাবেন।)

কাছাকাছি ধরনের পদসোপানিক ব্যবস্থা দেখা যায় **তাহিতি**দের মধ্যে। এই সমাজে চীফের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র ধরে পদসোপান নির্ধারিত। এই মর্যাদাভেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অর্থ আছে তাহিতিদের মাঝে। সেখানে ভাবা হ'ত সমাজের প্রত্যেক মানুষেরই একটা অলৌকিক শক্তি আছে

– *মানা*। এই মানা কার কতটা থাকবে তা নির্ভর করে তার পদমর্যাদার ওপর। চীফের সবচেয়ে নিকটাত্মীয়দের মানা সবচেয়ে বেশি থাকবে। কিছু পলিনেশীয় দ্বীপে সর্বোচ্চ প্রধানকে সবকিছু থেকে আলাদা রাখা হ'ত। এমনকি তিনি এমন এক ভাষা ব্যবহার করতেন যা সমাজের অন্যরা ব্যবহার করবার অনুমতি পেতেন না। মেলানেশিয়ার কিছু দ্বীপে উঁচু মর্যাদার কাউকে সম্মান প্রদর্শন করবার নজির আছে মাথা নিচু করে। যদি প্রধান দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর সামনে দিয়ে যাবার সময়ে অন্যরা মাথা নিচু করে সম্মান দেখাবেন। সেটাই রেওয়াজ। কোন কোন পদসোপানিক সমাজে চীফকে দেখে মনে হতে পারে তিনি আসলেই বোধহয় সম্পদশালী। তাঁদের বাসস্থান বড় হতে পারে, কিছু দ্রব্যাদি বাড়তি থাকতে পারে। অনেক সময় হয়তো সমাজের অন্যরা চীফকেই জমির 'মালিক' বলছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই সেই জমি ব্যবহার করতে পারতেন। আর এই শব্দ দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই তাঁকে মালিক বোঝায় না। এটা সম্মান দেখানোর জন্য। আবার তাঁর বড় আবাসস্থান আছে এই কারণে যে সেখানে ভোজের জন্য কিংবা অন্য কোন উৎসবের জন্য ঘর ব্যবহার করা হয়।

পদসোপানিক সমাজ বলতে যে সকল অ-ইউরোপীয় সমাজের কথা বলা হয়েছে সেখানে মর্যাদার ভেদাভেদ আছে, কিন্তু সমাজে এক দল মানুষ অন্য দলকে শোষণ করছে না। কিংবা কারো পক্ষে সম্পদের পাহাড় বানাবার সুযোগ নেই। ফলে স্তর বিন্যস্ত বা শ্রেণী বিভক্ত সমাজের চেয়ে এই ধরনের সমাজ স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র।

বর্তমান বিশ্বে মর্যাদার ভেদাভেদ

এসব সমাজে মর্যাদার ভেদাভেদ আছে, কিন্তু সমাজে একদল অন্যদলকে শোষণ করছে না।

সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে একটা জনপ্রিয় ধারণা আছে। সেটা হ'ল: সম্পদের ভিত্তিতে সমাজে যে ভেদাভেদ তা দিয়েই শিল্পভিত্তিক সমাজের বৈষম্য বোঝা যাবে। কিন্তু শিল্পভিত্তিক সমাজের সকল বৈষম্য সম্পদ দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। সামাজিক মর্যাদার অত্যন্ত শক্তিশালী চর্চা শিল্পভিত্তিক সমাজে রয়েছে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আধুনিক সমাজেই বরং মর্যাদার মাধ্যমে ভেদাভেদ অত্যন্ত তীব্র। আগের পাঠগুলোতে আপনারা নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং বয়সের ভিত্তিতে ভেদাভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে সেই প্রসঙ্গ মনে রেখে আলোচনা করা সুবিধাজনক হবে।

প্রথমেই আমরা চাকুরির ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দিতে পারি। পৃথিবীতে এখন সবচাইতে বেশি ব্যয় করা হয় সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার জন্য। আর সামরিক বাহিনী হচ্ছে সবচেয়ে নিয়ন্ত্রিত একটা ব্যবস্থা। এখানে প্রত্যেকটা পদের সাথে অন্য পদের প্রভেদ স্পষ্ট করে দেখানো আছে। সাধারণ সৈনিকরা সকল সময় অফিসারের হুকুম পালন করেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য থাকে না। এমনকি নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা জেনেও কোন দায়িত্ব পালন করতে হবে যদি সেটা অফিসারের আদেশ হয়। অফিসারদের মধ্যেও আবার পদমর্যাদার ভেদাভেদ আছে। সকল বয়োকনিষ্ঠ অফিসার তাঁর উর্দ্ধতন কর্মকর্তার আজ্ঞাবাহী থাকেন। এভাবে কোন দেশের সমগ্র সামরিক বাহিনী একটা পিরামিডের আকার ধারণ করে। এর সর্বোচ্চ স্থানে থাকেন যিনি ঐ দেশের সামরিক বাহিনীর প্রধান। যদি দুই দেশের সামরিক বাহিনী একত্রে কোন অভিযানে অংশ নেয় তাহলে দুর্বল শক্তির দেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা একই মর্যাদায় থাকলেও সবল দেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের অধীনস্ত হয়ে পড়েন। সামরিক বাহিনীর মধ্যকার মর্যাদার প্রসঙ্গ খুব বিশেষ কিছু মনে হতে পারে। কিন্তু আধুনিক সমাজের যে কোন চাকুরিতেই এই পদসোপানিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। তা সে ব্যাঙ্ক হোক, বীমা হোক আর, শিক্ষায়তনের কোন কাজ হোক। সকল ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কিছু আচরণ বিধি লিখিতভাবে বা অলিখিতভাবে থাকে। এগুলিকে সাধারণ ভাষায় আদব-কায়দা হিসেবে বলা হয়। এই আলোচনা হচ্ছে একই ধরনের আর্থিক সম্পদের মানুষজনের কথা বিবেচনা করে। চাকুরি যদি শ্রমিকের হয় তাহলে মর্যাদার অবস্থান অনেক নিচে।

আধুনিক সমাজে ... মাধ্যমে ভেদাভেদ অত

বাংলাদেশের মতন একটি প্রান্তিক পুঁজিবাদী দেশে আসা যাক। আমাদের সমাজে একটা ধারণা চালু আছে যেটা গভীরভাবে মর্যাদা কেন্দ্রিক। সেটা হচ্ছে 'খান্‌দান'। এটা দিয়ে সাধারণভাবে বংশ মর্যাদা বোঝানো হয়ে থাকে। সামাজিক মেলামেশা এবং সম্পর্ক তৈরিতে খান্‌দানের ধারণা অত্যন্ত শক্তিশালী। কাউকে হেনস্তা করবার জন্য বলা হয়ে থাকে 'দেখতে হবে না কোন্ বংশ থেকে এসেছে!' বংশ মর্যাদা মাপার কতগুলো প্রচলন আছে। একটা হচ্ছে কাদের পরিবার বা বংশ কত আগের 'জমিদার' কিংবা সম্পদশালী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখানে পিতৃবংশের কথা ভাবা হয়ে থাকে। তবে মাতৃবংশের যদি সম্পদশালী অতীত থাকে সেটাও হিসেব করা হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে। যদিও ব্রিটিশ কালে জমিদার বলতে ব্রিটিশদের অনুগত কিছু মানুষজনই ছিল তবু এটা তেমন আলোচনায় আসে না। খান্‌দান বা বংশ মর্যাদা মাপামাপির ক্ষেত্রে গত তিন চার দশকে আরও কিছু উপকরণ চালু হয়েছে। যেমন: চাকুরি কিংবা শিক্ষা। কোন্ পরিবার কত আগে থেকে 'সম্মানজনক' চাকুরি করছেন তার ভিত্তিতে সেই পরিবারের বংশ মর্যাদা ধরে নেয়া হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়ে চাকুরির মর্যাদা সরকারী চাকুরির দিকে বেশি ছিল। পরবর্তীতে উচ্চ বেতনের বেসরকারী চাকুরি আরও মর্যাদার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার প্রসঙ্গটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং তা চাকুরির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ ধরনের মর্যাদার বোধ এতটাই শক্তিশালী যে বিয়ে সাদী বা অন্যান্য কোন উৎসবে এগুলো হিসেব করে মেহ্‌মান ডাকা হয়। তাছাড়া বিয়ে করার জন্য জোড়া বাছাইয়ের সময় পরিবারের লোকজন কম বংশ মর্যাদার কাউকে বিবেচনা করেন না। এখানে যে প্রবণতার কথা আলোচনা করা হচ্ছে তা অবশ্যই মূলত স্বচ্ছল শ্রেণীর মানুষজনের ক্ষেত্রে সত্যি। তবে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখা দরকার যে শ্রেণীর সাথে বংশ মর্যাদা সম্পর্কিতভাবে কাজ করে। যেমন: কোন বিয়েতে পাত্র বা পাত্রীর বংশ খুব পছন্দ হ'ল না অপর পক্ষের। সেখানে পাত্র/পাত্রীর পরিবারের আর্থিক অবস্থা মজবুত হলে সেটার জোরে সম্পর্ক হতে পারে। এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসঙ্গের গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইদানিং কালে আর একটি মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে বিদেশ ভ্রমণ। অবশ্য এই প্রবণতাটি ভিন্ন ভাবে ব্রিটিশ কালেও ছিল। এর সঙ্গে আরেকটি মাত্রা হচ্ছে ইংরেজী জানা। মর্যাদার ধারণার সঙ্গে মর্যাদা রাখতে পারাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। মর্যাদা রাখার প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে অধিক ভোগ করা। অর্থাৎ আধুনিক কালের নগর সমাজে যত বেশি পরিমাণে ভোগ্যপণ্য খরিদ করা হয় ততই বেশি মর্যাদাবান থাকবার একটা ব্যবস্থা আছে। এটাকে কথ্য ভাষায় এই শ্রেণীর লোকজন বলে থাকেন 'স্টেটাস রাখা'।

সামাজিক মেলামেশা এবং সম্পর্ক তৈরিতে খান্‌দানের ধারণা অত্যন্ত শক্তিশালী।

আধুনিক কালের নগর সমাজে যত বেশি পরিমাণে ভোগ্যপণ্য খরিদ করা হয় ততই বেশি মর্যাদাবান থাকবার একটা ব্যবস্থা আছে।

বর্তমান কালে মর্যাদার ব্যাপার কতগুলো সূক্ষ্ম উদাহরণেও দেখা যেতে পারে। বড় শহরের প্রায় সব মধ্যবিত্ত গেরস্তালিতে কাজকর্মের জন্য গৃহশ্রমিক আছেন। চলতি ভাষায় এঁদেরকে 'বুয়া' বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণত নারী। এই গৃহশ্রমিকেরা সকলেই অতি দরিদ্র শ্রেণীর সদস্য এবং মাস ভিত্তিক চুক্তিতে কাজ করে থাকেন। মানে দিনের শ্রম ঘণ্টা মেপে এঁদের কাজ বা মজুরি হয় না। যেহেতু গৃহশ্রমিকেরা সকলে স্বচ্ছল ঐ মধ্যবিত্তের গৃহেই থাকেন, তাই একই স্থান ব্যবহার করতে হয়। কোন্ ঘরে তিনি থাকবেন তার একটা ব্যবস্থা থাকে, বলাই বাহুল্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেটা যথাসম্ভব নিচু মানের। কিন্তু পাশাপাশি কোন্ ঘরে তিনি কাজের জন্য আসবেন এবং অন্য সময়ে আসতে পারবেন না সেটারও পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এটা কেবল ঘর বা জায়গা ব্যবহারের বেলাতেই নয়, টেলিভিশন দেখা, মেহ্‌মানদের সাথে কথা বলা বা হাসা, গান গাওয়া বা অন্যান্য অনেক কিছুর ব্যাপারই নিষেধাজ্ঞা থাকে। এখানে এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারগুলো কেবল আর্থিক বা সম্পদের প্রসঙ্গ দিয়ে বোঝা যাবে না। কারণ সেই পার্থক্য তো তাঁকে মজুরি দেয়ার সময়েই চুকে গেছে। এখানে ভেদাভেদটা আসলে মর্যাদার। গৃহমালিক পক্ষের মানুষজন গৃহশ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে সব সময় তাঁকে সতর্ক রাখতে চান বলেই এই নিষেধাজ্ঞা।

র রঙের ভেদে মানুষের দার ভেদাভেদ হচ্ছে।

আর একটা ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হচ্ছে গায়ের রং। প্রচলিতভাবে আমাদের সমাজে অনায়াসেই লক্ষ্য করা যায় গায়ের রঙের ভেদে মানুষের মর্যাদার ভেদাভেদ হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে যাঁদের গায়ের রঙ হল্‌দেটে তাঁদেরকে বেশি মর্যাদা দেয়া হয়। এটা আমাদের একটা স্থানীয় বিষয় মনে

হলেও আসলে এর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট আছে। সারা পৃথিবীতে শ্বেতাঙ্গ মানুষজনের দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষজন নিপীড়িত হয়েছে। এই ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। এখন অধিকাংশ রাষ্ট্রেই কাগজে কলমে এই বৈষম্য আর নেই। আইনগত ভাবে সকলে সমান। কিন্তু বাস্তবে এখনও দেখা যায় কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব বহু শ্বেতাঙ্গ সমাজে আছে। এই বিদ্বেষ অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক আক্রমণ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। যে সব সমাজের মানুষ আফ্রিকার মত কৃষ্ণবর্ণের নয় সেখানে অনেকের দৃষ্টিভঙ্গিই শ্বেতাঙ্গ ধ্যান-ধারণা দিয়ে গঠিত। যেমন আমাদের সমাজ।

সারাংশ

নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই সমাজের সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য-বিভেদের ভিত্তিতে তিন ধরনের সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন। সমতাভিত্তিক, পদসোপানিক এবং শ্রেণীভিত্তিক। যে সকল সমাজে সদস্যদের মধ্যে মর্যাদায় তারতম্য আছে তাকে পদসোপানিক সমাজ বলা হয়। এর মানে হচ্ছে সদস্যদের মধ্যে সম্পদের তেমন তারতম্য নেই। এবং একদল মানুষ অন্যদের শোষণ করেন না। আধুনিক সমাজে শ্রেণী বিভেদের পাশাপাশি মর্যাদার ভেদাভেদ অত্যন্ত তীব্র। নগর সমাজে যত বেশি পরিমাণে ভোগ্যপণ্য খরিদ করা হয় ততই বেশি মর্যাদাবান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে শ্রেণীর সঙ্গে মর্যাদার প্রসঙ্গ মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। বৈষম্যের ভিত্তিতে নৃবিজ্ঞানীরা কত ধরনের সমাজকে চিহ্নিত করেছেন?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

২। নিচের কোন সমাজে চীফের সঙ্গে আত্মীয়তার স ত্র ধরে পদসোপান নির্ধারিত হয়?
ক. ইনুইত খ. তাহিতি
গ. মাসাই ঘ. তিরিকি

৩। নিচের কোন শব্দটি গভীর ভাবে মর্যাদা কেন্দ্রিক?
ক. খান্‌দান খ. বংশ
গ. কূল ঘ. জমিদার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পদসোপানিক সমাজ (rank society) কাকে বলে?
২। সমতা ভিত্তিক সমাজের সাথে পদসোপানিক সমাজের পার্থক্য দেখান।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নৃবিজ্ঞানীরা পদসোপানিক সমাজকে একটা মধ্যবর্তী দশা হিসেবে দেখেছেন – ব্যাখ্যা করুন।
২। অনেকেই বলে থাকেন আধুনিক সমাজে সম্পদ, মর্যাদা আর ক্ষমতা পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়। আপনি কি মনে করেন?

পাঠ - ৪

শ্রেণী ও জাতিবর্ণ স্তরবিভাজন
Class and Caste Stratification

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- শ্রেণী বলতে কী বোঝায়

- জাতিবর্ণের বৈশিষ্ট্য
- বর্তমান কালে জাতিবর্ণ এবং শ্রেণী পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত

সাধারণভাবে সম্পদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যে ফারাক তাকে শ্রেণী বলে।

সামাজিক ভেদাভেদ বুঝবার জন্য বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে শ্রেণী। আমরা সাধারণভাবে এই ধারণার সঙ্গে পরিচিত। প্রায়শই আমরা ধনী গরিব এই শব্দগুলো ব্যবহার করে থাকি। এখানে এই শব্দ দুটো দিয়ে আমরা কোন মানুষের আর্থিক সঙ্গতি বুঝিয়ে থাকি। সেটা কেবল টাকা পয়সা অর্থে নয়। ধনী বলতে সাধারণত সম্পদশালীকে বোঝানো হয়ে থাকে। আর গরিব বলতে সম্পদ নেই এমন মানুষকে বোঝানো হয়ে থাকে। তবে শব্দ দুটোর একটা তুলনামূলক ব্যবহার আছে। সেটা হচ্ছে কেউ কারো চেয়ে কম সম্পদশালী হলে বলা হয়ে থাকে – তার তুলনায় গরিব। এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে শ্রেণী বোঝা যেতে পারে। সাধারণভাবে সম্পদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যে ফারাক তাকে শ্রেণী বলে। সম্পদশালী শ্রেণীকে উচ্চ শ্রেণী বা ধনী শ্রেণী আর সম্পদহীনকে নিু শ্রেণী বা গরিব শ্রেণী বলা হয়ে থাকে। তবে সামাজিক বিজ্ঞানের লেখাপড়ায় আরেক ভাবে এটাকে বলা হয়ে থাকে – উচ্চবিত্ত এবং নিুবিত্ত। এর পাশাপাশি মধ্যবর্তী একটা শ্রেণীকে বোঝানোর জন্য মধ্যবিত্ত বলে একটা ধারণা ব্যবহার হরা হয়। এটা আমরা চলতি ভাষাতেও ব্যবহার করি।

জাতিবর্ণ বলতে এমন এক ভেদাভেদ ব্যবস্থা বোঝায় যা কোন মানুষের জন্মের সময়েই নির্ধারিত হয়ে যায়। যেমন: ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ বলেই পরিচিত হবে।

যদিও সম্পদের ভিত্তিতেই শ্রেণী গঠিত হয় বলে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, অনেক বিশে- ষকই বলেছেন শ্রেণী বুঝবার জন্য কেবল সম্পদের ভিত্তিতে এগোলে চলবে না। এর সঙ্গে মর্যাদা, ক্ষমতা এগুলোকে সম্পর্কিত করে দেখা লাগবে। পক্ষান্তরে, জাতিবর্ণ বলতে এমন এক ভেদাভেদ ব্যবস্থা বোঝায় যা কোন মানুষের জন্মের সময়েই নির্ধারিত হয়ে যায়। যেমন: ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ বলেই পরিচিত হবে। শ্রেণী যদিও বর্তমান পৃথিবীর সকল সমাজেই দেখতে পাওয়া যায়, জাতিবর্ণ প্রথা কেবলমাত্র ভারতবর্ষ এবং আশেপাশে পাওয়া সম্ভব বলে অনেক নৃবিজ্ঞানীরা বলেছেন। তাঁদের মতে, এটা কেবল হিন্দু সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অন্য অনেক নৃবিজ্ঞানীরা বলেছেন – ভারতবর্ষের এই জাতিবর্ণ আপাত স্বতন্ত্র হলেও এই স্তরবিন্যাস অন্য সমাজেও আছে। তাঁরা উল্লেখ করেছেন জাপান, আফ্রিকার কিছু অঞ্চলের কথা। দুই একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ভেদাভেদকেও জাতিবর্ণ প্রথার মত বলে উল্লেখ করেছেন। নৃবিজ্ঞানে এই দুই স্তরবিভাজনকে সমাজে সত্যিকার ভেদাভেদকারী হিসেবে দেখা হয়েছে – শ্রেণী এবং লিঙ্গ। এক্ষেত্রে এই দুইয়ের একটা সম্পর্ক টানার চেষ্টা করেছেন অনেক নৃবিজ্ঞানী। তাঁদের ব্যাখ্যা হ'ল:এই দুই স্তরবিভাজনের পার্থক্য হচ্ছে একটাতে সদস্যরা তাঁদের স্তর অর্জন করেন, অন্যটাতে সদস্যদেরকে স্তরে সামিল করানো হয়। অর্থাৎ সমাজে কোন মানুষ কোন শ্রেণীতে জন্মালেও নানা উপায়ে তিনি তাঁর শ্রেণী বদলে অন্য শ্রেণীতে চলে যেতে পারেন। তাঁর সম্পদ কোন কারণে বৃদ্ধি পেলে বা খোয়া গেলে। আর কোন জাতিবর্ণের সদস্যরা সারা জীবন তাঁর অবস্থান বদলাতে পারবেন না। যেহেতু তিনি যাই করুন না কেন ঐ জাতিবর্ণের সদস্য পদ ত্যাগ করা সম্ভব নয়। শ্রেণী এবং জাতিবর্ণের মধ্যে এই পার্থক্য খুবই সরল এবং তেমন কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না, বিশেষত বর্তমান কালে। কোন একজন দুইজন দরিদ্র মানুষের হঠাৎ ধনী হয়ে যাবার গল্প নিশ্চয় আছে। কিন্তু তা দিয়ে সমস্ত দরিদ্র শ্রেণীর সামাজিক জীবন ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

কেবল সম্পদের বেশি পরিমাণ দিয়ে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক সুবিধা এবং দাপট বোঝা যাবে না। সে কারণেই ক্ষমতা এবং মর্যাদার প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু খোদ সম্পদ থাকবার মানে কি – সেটাও তলিয়ে দেখা দরকার। সম্পদ থাকার প্রধান মানে হচ্ছে নানান ধরনের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব এই শ্রেণীর পক্ষে। বিশেষ করে এই মুহূর্তের পৃথিবীতে খোলা বাজারে সকল কিছু কেনা সম্ভব। নানান দ্রব্য কেনা বা জোগাড় করার মানে হচ্ছে সেই শ্রেণীর সুবিধা ও আরাম আয়েশ নিশ্চিত হচ্ছে। বাড়ি হোক, গাড়ি হোক, প্রসাধনী হোক আর খাবার হোক। সেটা একটা বিরাট ব্যাপার। এক পক্ষের আরাম আয়েশ মানেই অন্য পক্ষের দুর্ভোগ এবং বঞ্চনা। ক্ষমতা, মর্যাদা এবং নানারকম বাড়তি সুবিধা পাওয়ার মধ্য দিয়ে এই শ্রেণীর আচার-আচরণ, মনোভাব, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদিতেও বড়সড় পরিবর্তন ঘটে। আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণার এই বদল কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এটা একটা শ্রেণীগত ব্যাপার। এভাবে শ্রেণী বলবার সাথে সাথে কেবল সম্পদের পার্থক্যই নয়, আমরা মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণার পার্থক্যও

শ্রেণী বলবার সাথে সা
সম্পদের পার্থক্যই নয়
মন-মানসিকতা, ধ্যান
পার্থক্যও বুঝতে পারি

বুঝতে পারি। সেই সঙ্গে শ্রেণীগুলোর মধ্যকার সম্পর্ককেও বুঝতে পারি। উপরন্তু সম্পদ থাকার আর একটা অর্থ হচ্ছে সম্পদশালী ব্যক্তি অন্যান্য সম্পদহীনকে কাজ দিতে পারে। এটা শুনতে যে রকম আরামদায়ক শোনায় তেমন নয় মোটেই। এর মানে হ'ল: ধনী শ্রেণী সম্পদের জোরে গরিব শ্রেণীর শ্রম কিনে নিতে পারে।

মজুরি, মুনাফা এবং মালিকানা

শ্রেণীর সঙ্গে এই ধারণাগুলো খুবই সম্পর্কিত। আগেই বলেছি যে সম্পদশালী শ্রেণী অনায়াসে সম্পদহীন শ্রেণীর শ্রম খরিদ করে নিতে পারে। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে সকল কিছু উৎপাদন হবার জন্যই শ্রম প্রয়োজন পড়ে। আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন যে অনেক সমাজে উৎপাদন হয় সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে, সকলের শ্রমে। সেই রকম ব্যবস্থায় যে উৎপাদন হয় তার বিশেষ কোন মালিকানা থাকে না। যে কারো ভোগদখলের জন্য সেই সামগ্রীর ব্যবহার সম্ভব হয়। এভাবে উৎপাদনের শরীকী ব্যবস্থা টিকে থাকে। আবার ভোগের ক্ষেত্রেও শরীকী। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবসার উৎপাদনের প্রক্রিয়া একেবারেই ভিন্ন। এখানে কোন দ্রব্যের উপর মালিকানা আছে। অর্থাৎ উৎপাদিত সকল দ্রব্যেরই দাবীদার থাকেন। আধুনিক সমাজে এই দাবীদারের দাবীকে আইনও সমর্থন করে। সম্পদশালী শ্রেণী যখন শ্রমিককে শ্রমের একটা মজুরি দিয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ উৎপাদিত দ্রব্যটির মালিকানা তার হয়ে যায়। সেই দ্রব্যটি আর সেই মজুর দাবী করতে পারেন না। এই প্রক্রিয়ায় সম্পদশালী শ্রেণীর হাতে আরও সম্পদ জমতে থাকে। বিষয়টাকে একটু ব্যাখ্যা করা যায়।

এখানে শ্রমের প্রসঙ্গটাকে আবার ভাবা দরকার। আমরা এমন একটা কিছুর কথা ভাবতে পারি না যার পিছনে কোন শ্রমিকের শ্রম নেই। একটা আলপিন থেকে শুরু করে বড় বড় ইমারত পর্যন্ত সকল কিছু। এখন শ্রমিকের মজুরি দিয়ে দেবার পর সেই দ্রব্যটি মালিকের হয়ে যায় যিনি শ্রমের একটা মজুরি দিয়েছেন। এই দ্রব্যটি তখন খোলা বাজারে বিক্রি করে মালিক দ্রব্যটির দাম পাবেন। দ্রব্যটির দাম তিনি যা মজুরি দিয়েছেন তার থেকে ঢের ঢের বেশি। এই বাড়তি যে টাকা তিনি লাভ করলেন এটাই তার মুনাফা। মালিকের যত উৎপাদন হতে থাকবে ততই তাঁর মুনাফা। অবশ্যই বিক্রি হতে হবে। একদিকে মালিকের যত উৎপাদন ততই মুনাফা বা লাভ। অন্যদিকে, শ্রমিকের ততই ক্ষতি। কারণ ঐ দ্রব্যটা উৎপাদন করবার জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন ছিল তা তিনি দিয়েছেন, কিন্তু সেই শ্রমের মজুরি দিয়ে ঐ দ্রব্যটা কেনার আর কোন উপায় নেই তাঁর। ঐটার দাম এখন তাঁর প্রাপ্য মজুরির থেকে বহু পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। তাহলে চিন্তা করলে বোঝা যায় প্রত্যেকটা জিনিস উৎপাদন করা বা বানাবার সাথে সাথেই সেই জিনিসের সঙ্গে শ্রমিকের দূরত্ব বাড়তে থাকে। মানে সেটার খদ্দের থাকা তখন আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

একদিকে শ্রমিক শ্রম দিয়ে আরো নিম্নগামী অবস্থায় চলে যাচ্ছেন। অন্যদিকে মালিক কোন শ্রম না দিয়ে আরো ঊর্দ্ধগামী অবস্থা অর্জন করছেন।

প্রত্যেকটা দ্রব্যের পেছনে যেমন শ্রমিক আছেন, তেমনি মালিকও আছেন। এভাবে সমাজে দুই শ্রেণীর বৈষম্য বাড়ছেই। এটা সত্যি যে মালিকের কাঁচামাল খরিদ করতে হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এই একই চক্র। একটা পর্যায়ে সকল কাঁচামালই প্রকৃতিতে ছিল। ফলে দ্রব্যের উপর থেকে শ্রমিকের দাবী হারানোর ব্যাপারটাকে সমর্থন করবার মত তেমন যুক্তি থাকে না। এই প্রক্রিয়ায় একদিকে শ্রমিক শ্রম দিয়ে আরো নিম্নগামী অবস্থায় চলে যাচ্ছেন। অন্যদিকে মালিক কোন শ্রম না দিয়ে আরো ঊর্দ্ধগামী অবস্থা অর্জন করছেন। উভয়ের মধ্যে এই সম্পর্কের কারণে ধনী গরিব শ্রেণীর নাম কখনো কখনো বলা হয় – **মালিক শ্রেণী** ও **শ্রমিক শ্রেণী**। মালিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্ককে শোষণের সম্পর্ক বলা হয়। কারণ শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়েই মালিক শ্রেণীর মুনাফা হতে থাকে। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষজনের উপর নানা ধরনের নির্যাতনের এটা একটা দিক মাত্র। এই যাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে শ্রমিকেরা বারংবার আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁদের জীবনে এখন পর্যন্ত খুব একটা বদল আসেনি – সেটা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এখানে এই আলোচনাটি একভাবে খুব সহজভাবে করা হয়েছে। সমাজে শ্রেণী সম্পর্কের বিষয়গুলো এর থেকে ঢের কঠিন। যেমন এই আলোচনায় একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তা হচ্ছে: মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহলে কোথায় গেল? তাছাড়া একটা যুক্তির সমস্যাও দেখা দেয়। সেটা হ'ল: সমাজে সকল মানুষ স্পষ্টভাবে মালিক কিংবা শ্রমিক-এর কাতারে পড়েন কিনা।

মধ্যবিত্ত চাকুরে-ব্যবসায়ী শ্রেণী

পুঁজিবাদী সমাজে একটা শ্রেণী আছে যার সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে মালিক নয়, আবার শ্রমিকও নয়। এখানে কাজ না পাওয়া শ্রমিকদের কথা হচ্ছে না। একটা স্বচ্ছল শ্রেণীর কথা হচ্ছে। সাধারণভাবে এঁরাই হচ্ছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীর সদস্যরা রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করে থাকেন, কিংবা পণ্যের বাণিজ্য করে থাকেন। আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নানাবিধ দপ্তর এবং বিভাগ করা হয়েছে। এই সকল দপ্তর ও বিভাগে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের কিছু কর্মচারী প্রয়োজন পড়ে। সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে শিক্ষক অব্দি। সেই সকল কর্মচারীরা রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে বেতন পেয়ে থাকেন। এছাড়া সরকারী দপ্তর ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী দপ্তরে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। চাকুরির আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে শিল্প, কল-কারখানার ব্যবস্থাপনা। যে সব কর্মস্থলে শ্রমিকরা শ্রম দিয়ে দ্রব্য উৎপাদন করে থাকেন, সেখানে ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজিং-এ অনেক কর্মী চাকুরি করেন যাঁরা শারীরিক শ্রম দিয়ে কিছু উৎপাদন করেন না। তবে তদারকি করেন। ব্যবসায়ী গোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে কোন শিল্প-কারখানার মালিক নাও হতে পারেন। তাঁরা এক স্থানে উৎপাদিত দ্রব্য অন্য স্থানে বেচাকেনার কাজ করে থাকেন। তবে ব্যবসায়ী শব্দটি দিয়ে সাধারণভাবে এত কিছু বোঝায় যে এটি নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটবার সুযোগ আছে। আগের আলোচনায় যাঁদের মালিক বলা হয়েছে তাঁদের অনেকেই নিজেকে পরিচয় দেবেন ব্যবসায়ী বলে। তবে বৃহৎ শিল্প-মালিকদের বেলায় **শিল্পোদ্যোক্তা** বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট পরিচয়টা চলে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর... গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এঁরাও কোন উৎপাদন কাজে অংশ নেন না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্যদের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য খেয়াল করার মত। প্রথমেই বলা যায় শিক্ষার কথা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন এই শ্রেণীর একটা বৈশিষ্ট্য। আর চাকুরির ক্ষেত্রেও এটা প্রয়োজনীয় বটে। উচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেবার পর যে ধরনের চাকুরি করা হয় তাকে বলা হয় হোয়াইট কলার জব। বাংলায় আমরা সম্মানজনক চাকুরি বলতে পারি। এই শ্রেণীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক উচ্চবিত্তের মতই কঠোর। এঁদের পরস্পরের প্রতি তেমন কোন সংহতি লক্ষ্য করা যায় না। দরিদ্রদের দিক থেকে সেটা সঙ্গত। কারণ প্রত্যেক মধ্যবিত্ত পরিবারের দেখভালের শ্রম তাঁদেরই দিতে হয়। আর সেখানেও তাঁর শোষণের অভিজ্ঞতাই হয়ে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বরং উচ্চবিত্তের দিকেই বেশি টান দেখায়। এই শ্রেণী আশা-আকাঙ্ক্ষার ধরনও উচ্চবিত্তের সঙ্গে মেলে বেশি। এই শ্রেণীর তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এঁরাও কোন উৎপাদন কাজে অংশ নেন না। সে কারণে কোন কোন বিশে- ষক সমাজের মানুষজনকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন – **উৎপাদক শ্রেণী** এবং **অনুৎপাদক শ্রেণী**। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে দরিদ্র মানুষজনের, আর অন্য সকলে (মালিক সমেত) অনুৎপাদক শ্রেণী। আবার উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভোগ্যপণ্যের প্রায় সবটারই খদ্দের বলে এঁদের **ভোক্তা শ্রেণী**ও বলা হয়ে থাকে।

সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজ-কর্মকে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু সমস্যা হ'ল: গরিব শ্রেণীর পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের আবার তেমন দরকার পড়ে না। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে ধরনের কাজ করে কিংবা পেশায় নিয়োজিত হয় তার ফলাফল কেবল নিজেদের ভোগে ও মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। তা সে গান, নাটক, উপন্যাস হোক আর অফিসের ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করা হোক। কিন্তু গরিব শ্রেণীর গান কিংবা সাহিত্য বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ বলে গণ্য হয় না। অবশ্যই মালিক শ্রেণীর কারখানা বা উৎপাদন ক্ষেত্র চালু রাখার জন্য এই শ্রেণীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান পৃথিবীর সকল মহানগর এই শ্রেণীর মানুষজনের আবাসস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মানে এই নয় যে অন্যত্র মধ্যবিত্ত নেই কিংবা মহানগরে উচ্চবিত্ত বা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষজন থাকেন না। বরং মহানগরের যাবতীয় শারীরিক কাজ-কর্ম দরিদ্র মানুষজনই করছেন – ইমারত বানানো থেকে শুরু করে আবর্জনা পরিষ্কার করা অব্দি। কিন্তু মহানগরের মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা ভিন্ন গুরুত্ব বহন করে। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। যেহেতু চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী মানুষজন ও তাঁদের পরিবারকে মধ্যবিত্ত ধরে নেয়া হয়েছে তাই মধ্যবিত্ত বলতে মোটেই এক ধরনের স্বচ্ছলতা বোঝায় না। ঢাকা শহরের এ্যাপার্টমেন্টে বসবাসকারী পরিবার যেমন মধ্যবিত্ত, তেমনি গাইবান্ধার একজন মনোহারী দোকানদার মধ্যবিত্ত। মহানগরের মধ্যবিত্তদের গুরুত্ব হচ্ছে তাঁরাই সমাজের ধ্যান-ধারণা নিয়ন্ত্রণ করেন। শিল্প-সাহিত্য, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত চিন্তা-

গরিব শ্রেণীর গান কিং সাহিত্য বুদ্ধিবৃত্তিক কা গণ্য হয় না।

ভাবনাকেই প্রতিফলিত করে, দরিদ্রদের নয়। এ কারণেই কারো কারো মতে শ্রমিক শ্রেণী বা দরিদ্র মানুষদের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বড় বাধা।

ভারতবর্ষে জাতিবর্ণ প্রথা

এই অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের ভেদাভেদ প্রথার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থাতে বিশ্বাস করা হয় কোন মানুষ জন্মের সময়ই তাঁর সামাজিক অবস্থান নিয়ে আসেন। আর সেই অবস্থানটা বদলানো যায় না। এই বিশ্বাসের সাথে ধর্মীয় কিছু ব্যাখ্যাও প্রচলিত আছে। কিন্তু ভেদাভেদটা কেবল বিশ্বাসের নয়, সামাজিক অনুশীলনেও তা দেখা যায়। এটাকে নৃবিজ্ঞানীরা জাতিবর্ণ (caste) বলেছেন। কারো কারো মতে এটা সাব-কাস্ট (sub-caste)। লেখাপড়ার জগতে এটাকে জাতিবর্ণ বলা হলেও সমাজে চলতি ভাষায় মানুষজন একে 'জাত' শব্দ দিয়ে বুঝিয়ে থাকেন। অনেক নৃবিজ্ঞানীই মনে করেছেন এই বিশেষ ধরনের ভেদাভেদ ব্যবস্থা কেবল ভারতের সমাজেই আছে। এঁদের মধ্যে নাম বলা যায় লুই ডুমোর কথা।

এই অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের ভেদাভেদ প্রথা ... বিশ্বাস করা হয় কোন মানুষ জন্মের সময়ই তাঁর সামাজিক অবস্থান নিয়ে আসেন। আর সেই অবস্থানটা বদলানো যায় না। ... এটাকে নৃবিজ্ঞানীরা জাতিবর্ণ (caste) বলেছেন।

প্রত্যেকটি জাতিবর্ণ একটির থেকে আরেকটি ক্রমোচ্চভাবে সাজানো। এর মানে হ'ল সমাজের প্রত্যেক সদস্যেরই জাতিবর্ণের ভিত্তিতে একটা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান থাকে। নিচু জাতিবর্ণের লোকজন উঁচু জাতিবর্ণের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবেন না। অন্তত, অনেকগুলি সামাজিক বিধিনিষেধ আছে। প্রধান বিধিনিষেধ হচ্ছে বিয়ে এবং খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে। যে সব জাতিবর্ণকে উঁচু বলে ধরে নেয়া হয় তার সদস্যরা 'নিচু'দের সঙ্গে একত্রে খাবেন না। আর বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না। একটা জাতিবর্ণের সদস্যরা কেবল নিজেদের মধ্যেই বিয়ে করতে পারবেন – অর্থাৎ অন্তর্বিবাহ ব্যবস্থা। কিন্তু বিয়ে এবং খাবার-দাবারের মধ্যেই এই ভেদাভেদ সীমিত নয়। সামাজিকভাবে অনেক ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন নিচু জাতিবর্ণের লোকজন। একটা চর্চা আছে ছোঁয়া-ছুঁই নিয়ে। 'উঁচু' মানুষজন 'নিচু' মানুষজনের শারীরিক সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন। এক্ষেত্রে ধারণা করা হয় নিচু বর্ণের সংস্পর্শে উঁচু অপবিত্র হয়ে যাবেন। এর সামাজিক নাম হচ্ছে – 'জাত যাওয়া'। সুতরাং, বিয়ে বা খাদ্যগ্রহণে আপত্তির ভিত্তি হিসেবে এটাকে দেখা যায়। নৃবিজ্ঞানীরা এটাকে শুচিতার ধারণা বলেছেন।

শুচিতা-অশুচিতা কিংবা পবিত্রতা-অপবিত্রতা যাই বলি না কেন – এর একটা ব্যাখ্যা দেয়া হয় ধর্মগ্রন্থ থেকে। হিন্দু (সনাতন) ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ বেদ-এ চতুর্বর্ণ বা চারটি বর্ণের কথা উল্লেখ আছে। এগুলো হচ্ছে: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এখানে ব্রাহ্মণকে সবচেয়ে মর্যাদাবান এবং শূদ্রকে সবচেয়ে মর্যাদাহীন হিসেবে ব্যাখ্যা করা আছে। অন্য বর্ণ দুটিরও মর্যাদা নির্দিষ্ট করা আছে:

ব্রাহ্মণ -> ক্ষত্রিয় -> বৈশ্য -> শূদ্র

অনেক গবেষকই জাতিবর্ণ প্রথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বেদ-এ বর্ণিত চার বর্ণের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। কিন্তু বাস্তবে সমাজে ঠিক এইভাবে চারটি বর্ণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। যেমন: বাংলা অঞ্চলে ব্রাহ্মণ পাওয়া গেলেও বৈশ্য বা শূদ্রের একক অখন্ড কোন রূপ পাওয়া যায় না। বরং অনেক ধরনের বিভাজন পাওয়া যায় যাঁরা পরস্পরের থেকে আলাদা মনে করেন নিজেদের এবং সামাজিক নিয়ম-কানুনও সেভাবে গঠিত। বিয়ে-শাদী এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের বেলায় ভেদাভেদ প্রক্রিয়াটা কাজ করে থাকে। ক্ষত্রিয় বলতে এই অঞ্চলে তেমন কোন বর্ণ কখনোই ছিল না। প্রায় একশ' বছর আগে উত্তর বাংলার একটা অংশ নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা দেন। সেই ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয়দের অনেক পার্থক্য। বাংলা অঞ্চল হতে নিজেদের ক্ষত্রিয় ঘোষণা দেয়া এই পদক্ষেপকে বর্ণব্যবস্থার অবিচারের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ হিসেবেও দেখা সম্ভব। আবার বাংলা অঞ্চলে ব্রাহ্মণরাও কোন একটা নির্দিষ্ট বর্গ নন। পরস্পরের সাথে নানা সামাজিক দূরত্ব তাঁরা বোধ করেন এবং সেগুলো চর্চা করেন। কায়স্থ বলে একটা জাতিবর্ণ বিশেষভাবে বাংলা অঞ্চলেই দেখা যায়। এই ধরনের কোন নাম ভারতবর্ষের অন্য কোথাও দেখা যায় না। বস্তুত, ভারত বর্ষের সকল স্থানে নানাবিধ ভিন্নতা লক্ষ্য করা

ারত বর্ষের সকল স্থানে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় এক অঞ্চলের জাতিবর্ণ ভেদাভেদ অন্য অঞ্চলে কবারেই দেখা যায় না।

যায় এবং এক অঞ্চলের জাতিবর্ণ ভেদাভেদ অন্য অঞ্চলে একেবারেই দেখা যায় না। এক কথায় যত সরলভাবে জাতিবর্ণ-এর চার ভাগের কথা বলা হয় তত সরলরূপে সেটি সমাজে পাওয়া যায় না, নানাবিধ বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই পরিস্থিতি সামলাতে গিয়েই কোন কোন গবেষক sub-caste ধারণা ব্যবহার করেছেন।

সাধারণভাবে 'উঁচু' জাতিবর্ণের সদস্যরা আর্থিক ভাবেও স্বচ্ছল।

অনেক গবেষকই জাতিবর্ণ প্রথাকে প্রাচীন ভারতের শ্রম বিভাজন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ, সমাজে কার কি কাজ এবং উৎপাদন কাজে কার কি অংশগ্রহণ হবে তার ব্যবস্থা এই জাতিবর্ণ। এই ব্যাখ্যার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। বেদের ব্যাখ্যানুযায়ী ব্রাহ্মণ হবেন জ্ঞানী, ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, বৈশ্য ব্যবসায়ী এবং শূদ্র মজুর বা কায়িক শ্রমিক। ঠিক এরকম চারটি ভাগে ঐতিহাসিক দলিল না পাওয়া গেলেও এটা লক্ষ্য করা গেছে যে ভারতবর্ষের সমাজে জাতিবর্ণের সঙ্গে পেশার একটা যোগাযোগ ছিল। কিছুকাল আগে পর্যন্তও অনেক নজির পাওয়া গেছে যেখানে কোন একটি জাতিবর্ণের সদস্যরা বংশানুক্রমিকভাবে একটা নির্দিষ্ট পেশায় নিয়োজিত আছেন। যেমন: নাপিত, জেলে, কুমার, কামার, তাঁতী ইত্যাদি। এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখা দরকার, সাধারণভাবে 'উঁচু' জাতিবর্ণের সদস্যরা আর্থিক ভাবেও স্বচ্ছল।

পেশার দিক থেকে জাতিবর্ণের এই বিভাজন সমাজের অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রভাব রেখেছে বর্তমান বাজারের প্রসারের আগে সেটা বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। বিভিন্ন পেশার (নাপিত, কামার, কুমার ইত্যাদি) মানুষজন স্বচ্ছল গেরস্তদেরকে নিজেদের পেশার কাজ করে দিতেন। বিনিময়ে ফসল পেতেন। এই ধরনের আদান-প্রদানের নাম দেয়া হয়েছে **যজমানি** ব্যবস্থা। ব্রিটিশরা আসার পর বাজার ব্যবস্থার প্রসার ঘটে এবং বিভিন্ন শ্রমিক পেশার মানুষজন নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রির চেষ্টা করেন।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জাতিবর্ণ ভিত্তিক উপাধিও দেখা যায়। অর্থাৎ নামের শেষে যে অংশ ব্যবহার করা হয় সেটা দিয়েই জাতিবর্ণের অনুমান করা সম্ভব হয়। বাংলা অঞ্চলে সবচেয়ে সহজে বোঝা যায় ব্রাহ্মণদের পরিচয়। কতগুলি পরিচিত উপাধি হচ্ছে: ভট্টাচার্য্য, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্তী ইত্যাদি। যেহেতু 'নিচু' জাতিবর্ণের নির্দিষ্ট পেশার প্রচলন ছিল – তাই উপাধি দেখে তাঁদের বেলায় পেশাও বোঝাত অনেক ক্ষেত্রে। তবে নামের সঙ্গে উপাধি জুড়ে দেবার এই চল ব্রিটিশরা এখানে আসার আগে একই রকম ছিল না। আর্থনীতিক বিরাট বদলের মধ্য দিয়ে বর্তমান কালে পেশার এই ব্যাপারগুলো আর আগের মত নেই। যেমন: নাপিতদের সাবেক পেশায় এখন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের জাতিবর্ণ 'নাপিত' নয়, এমনকি অনেকে হিন্দু ধর্মের বাইরে। কাপড়ের কলে আর জাতিবর্ণ হিসেবে 'তাঁতী'রা কাজ করছেন না। ফলে নানা ধরনের পেশায় এসব জাতিবর্ণের সদস্যরা যাবার চেষ্টা করছেন। 'উচ্চবর্ণ' হিন্দুদের স্বচ্ছলতার কারণে ব্রিটিশ কালে তাঁরা শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে গেছেন সাধারণভাবে।

'উচ্চবর্ণ' হিন্দুদের স্বচ্ছ কারণে ব্রিটিশ কালে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবি অবস্থানে পৌঁছে গেছে সাধারণভাবে।

জাতিবর্ণ ভেদাভেদের এই প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবেই নিপীড়নমূলক। নিপীড়নের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছেন সমাজের একেবারে নিচে যাঁদের ভাবা হয়। এই ব্যবস্থার বিপক্ষে 'নিম্নবর্ণ' হিন্দুরা নানা সময়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। কখনো কখনো উচ্চবর্ণের কিছু সদস্য এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। এখানে দুইজনের নাম উল্লেখ করা যায়: মহাত্মা গান্ধী এবং স্বামী বিবেকানন্দ। বিশেষভাবে ভারতে নিম্নবর্ণ হিন্দু আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সেখানে সমতল বাংলার চেয়ে অনেক আক্রমণাত্মক ধরনের ভেদাভেদ রয়েছে। 'অস্পৃশ্য' বলে একটা বর্গ আছেন যাঁর সদস্যরা নিপীড়নের চরম সীমায় বসবাস করেন। কিন্তু বড়মাপের কোন পরিবর্তন এখনো লক্ষ্য করা যায় না। কয়েক বছর আগে চাকুরিতে নিম্নবর্ণ হিন্দুদের কিছু সুবিধা দেবার চেষ্টা যখন সরকার করেছে – তখন ব্রাহ্মণ সহ অন্যান্য তুলনামূলক উচ্চবর্ণ হিন্দুরা সারা দেশব্যাপী এর বিরুদ্ধে আস্ফালন শুরু করে।

সারাংশ

সম্পদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য তাকে শ্রেণী বলা হয়। তবে শ্রেণী বলবার সাথে সাথে কেবল সম্পদের পার্থক্যই নয়, আমরা মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণার পার্থক্যও বুঝতে পারি। আমাদের পরিচিত সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক আর মালিক বিবদমান দুইটি শ্রেণী। আর আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শ্রমিক শ্রম দিয়ে চলেছেন ন্যূনতম মজুরিতে। অন্যদিকে মালিক কোন শ্রম না দিয়ে সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জন করছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীও কোন উৎপাদন কাজে অংশ নেন না। জাতিবর্ণ বলতে এমন এক ভেদাভেদ ব্যবস্থা বোঝায় যা কোন মানুষের জন্মের সময়েই নির্ধারিত হয়ে যায়। অনেকের মতে এই অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যেই কেবল এই ধরনের ভেদাভেদ প্রথা চালু আছে। কিন্তু অন্য নৃবিজ্ঞানীদের যুক্তি হ'ল : এরকম বৈষম্য অন্য সমাজেও রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। হিন্দু (সনাতন) ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ বেদ -এ কয়টি বর্ণ -এর কথা উল্ল্যেখ রয়েছে?

ক. ২টি　　খ. ৩টি

গ. ৫টি　　ঘ. ৪টি

২। প্রত্যেকটি জাতিবর্ণ একটির থেকে আরেকটি ------------- ভাবে সাজানো।

ক. ক্রমোনিন্ম　　খ. ক্রমোচ্চ

গ. সমান্তরাল　　ঘ. আড়া-আড়ি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জাতিবর্ণ (caste) বলতে কী বোঝানো হয়ে থাকে?

২। শ্রেণী আর শোষণের সম্পর্ক কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কেবল সম্পদের পার্থক্য দিয়ে শ্রেণী ভেদাভেদকে কী ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

২। বলা হয়ে থাকে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে শুচিতা-অশুচিতার ধারণা। ব্যাখ্যা করুন।